নীলাঞ্জনছায়া

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
ইন্দ্র দুগার

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটোএনগ্রেভিং

ব্লক মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এজেন্সি

দাম : তিন টাকা

উৎসর্গ

কথাশিল্পী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের

॥ উপন্যাস ॥

তীরভূমি
জনপদবধূ
দেবকন্যা
জলকন্যার মন
সীমাস্বর্গ
শ্বেতকপোত
এজন্মের ইতিহাস
নীলসিন্ধু
সমুদ্রের গান
তীরভূমি
বিদিশার নিশা

॥ গল্পগ্রন্থ ॥

এক আশ্চর্য মেয়ে
সিন্দুর টিপ
একটি রঙ্ করা মুখ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

॥ তৃতীয় ব্যক্তি ॥

অবধারিত কোনও শোচনীয় দুর্ঘটনা থেকে দৈবাৎ কোনক্রমে বেঁচে গেলে, সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত মানসিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে-অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি পাণ্ডুর হয়ে গেল মুখের বর্ণ, নিশ্চল হয়ে গেল ভাবভঙ্গি—নিথর নিস্পন্দ এক প্রস্তর-মূর্তির মত বসে রইল কিছুক্ষণ আমাদের থার্ড ইঞ্জিনীয়ার সুরেশ্বর দাস। ওর ভাব দেখে আমার বা সেকেণ্ড অফিসার মহাদেবনেরও মুখে কোনও কথা সরছিল না। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট দুজনের হাতেই পুড়ে ছাই হচ্ছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের তাতে। ওর অবস্থা দেখে আমরাও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা ক্যাম্বিসের ডেক্‌চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমাদের কাছ ঘেঁষে বসে ছিল সুরেশ্বর। এক সময় সিগারেটের প্যাকেট বার করে, আমাদের দুজনকে একটা একটা দিয়ে নিজেও ঠোঁটে চেপে ধরল একটা। ধরে প্যাকেটটা আবার পকেটে রেখে দেশলাই বার করতে যাবে, ইতিমধ্যে মহাদেবন তার দেশলাইটা জ্বালিয়ে একটা কাঠিতেই তারটা আর আমারটা ধরিয়ে ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেছে। ও অভ্যাসমত সিগারেটটা আগুনে ছুঁইয়েই, হঠাৎ কী মনে করে ক্ষিপ্র হাতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত জাহাজের ডিউটিকে বলে, সেকেণ্ড ডগ্‌-ওয়াচ। এই সেকেণ্ড ডগ্‌-ওয়াচে কী এক যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সুরেশ্বরের ডিউটি পড়েছিল আজ। সেটার পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকে যেখানে আমি আর মহাদেবন বসে ছিলাম, সেখানে এসেছিল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে। সুন্দর হাওয়া বইছে, সমুদ্র খুবই শান্ত। সারা আকাশটা তারায় ভরা। চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত বুঝি।

কোথায় কার ঘরে যেন রেডিওতে বাজছে—উদাস-করা কোমল এক সুর।

মহাদেবনই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আমি অতটা বুঝতে পারি নি। ক্ষমা কর।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, ক্ষমার কী আছে? মানে হয় না এসব কুসংস্কারের।

কুসংস্কার! এতক্ষণে কথা ফুটল সুরেশ্বরের মুখে, গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, কোথায় বসে কথা বলছ? সমুদ্রের বুকে। এক কাঠিতে তিনটি সিগারেট ধরালে কী যে হয়, তোমরা ঠিক না জানলেও আমি জানি। থার্ড মাস্ট্ ডাই। তৃতীয় ব্যক্তি মরে যাবে নির্ঘাত।

বললাম, মানি না। সমুদ্রেই থাকি আর যেখানেই থাকি, কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলতে আমার বাধা নেই। আর তা ছাড়া, সুরেশ্বর, তোমার মত লোক যে এসব মানবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।

অ্যালিওয়ের যেটুকু বিচ্ছুরিত আলো এসে পড়েছে এই বোট-ডেকে, তারই স্বল্পালোকে বেশ দেখতে পেলাম, থরথর করে তখনও কাঁপছে ওর হাত দুটো। বললে, আমিও তোমার মত ওসব মানতাম না। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপারের পর আর না-মেনে আমার উপায় নেই। বলতে পার, বিদেশীদের এ সংস্কার আমরা ভারতের লোক হয়ে মানতে যাব কেন? এ কথা আমারও প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন তো জানতাম না—'ওয়ান্স এ সেলর অলওয়েজ এ সেলর!' একবার জলচর যদি হও তো চিরদিনের জন্য জলচরই হতে হবে তোমাকে। জলে তোমার স্বদেশ নেই, বিদেশ নেই, সব দেশ এক হয়ে যায়। অথবা নানান দেশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র এক দেশ, যেখানে ভাষা-ধর্ম-আচার-বিচার সব ছাড়িয়ে এক বিচিত্র মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। তুমি মাত্র সেদিন এসেছ জাহাজের লাইনে, তাও রাইটার হয়ে—আমাদের মত সাত-আট বছর কাটাও, তখন দেখবে, জাহাজী লোকের কাছে সংস্কার কী জিনিস!

একটু হেসে বললাম, বুঝেছি। কিন্তু তুমি পাস-করা ইঞ্জিনীয়ার, তুমি বল তো, এই যে এক কাঠিতে সিগারেট না-ধরানোর নিষেধ, এর পিছনে কোন্ যুক্তি আছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ্বর, যেন কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। তারপরে এক সময় হঠাৎ স্বপ্ন-দেখে-জেগে ওঠার মত, সোজা বসে চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার ওপর, বললে, আমি যে উনিশ বছর বয়সে ট্রেনিং-জাহাজে ভর্তি হয়ে ফায়ারম্যানের পরীক্ষা পাস করে ফায়ারম্যান হয়ে প্রথম জাহাজে ঢুকি, তা বোধ হয় জান না?

সবিস্ময়ে বললাম, তাই নাকি? তা তো কোনদিন বল নি!

মহাদেবন বললে, ফায়ারম্যান থেকে থার্ড ইঞ্জিনীয়ার, রিমার্কেবল্ কেরিয়ার। পরীক্ষাগুলো পাস করতে হয়েছে তো?

তা তো নিশ্চয়ই! সুরেশ্বর বললে, ভদ্রলোকের ছেলে, খেতে না পেয়ে জাহাজে ঢুকেছিলাম খালাসী হয়ে। কেউ জানত না যে, স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েও ছিলাম। সারেঙ আর ফার্স্ট টিণ্ডেলের পা-ও টিপেছি একদিন। কিন্তু যাক সে-কথা। যে কথা বলতে যাচ্ছি, তাই শোন। জাহাজের নাম করার দরকার নেই, ধরে নাও এরই মত সেও এক ইণ্ডিয়ান জাহাজ, কোস্টাল কার্গো নিয়ে ভারতের উপকূলে-উপকূলে ঘুরে বেড়ায়। এবং এও ধরে নাও যে, এ-জাহাজের মত সেটিও সেদিন যাচ্ছিল কলকাতা থেকে কলম্বো। এর মত তারও কলম্বোর কার্গোই ছিল বেশী। অর্থাৎ কলম্বোতে তার থাকবার কথা এরই মত বেশ কয়েকটা দিন।

কথায় বলে, দেয়ার ইজ নো প্রোমোশন উইদাউট্ দি ওশান। আমরা দুজন বছর আড়াই ধরে দু-দুটো মহাসমুদ্র পারাপার করে অবশেষে এক দেশী কোস্টাল জাহাজে 'ডঙ্কিম্যান' হয়ে ঢুকলাম। অর্থাৎ মাসিক মোট ১৩৫ টাকা থেকে ১৭১ টাকায় উঠেছিলাম। তখন এই রকমই মাইনের হার ছিল।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু দুজন! দুজন মানে?

একটু থেমে তারপরে সুরেশ্বর বললে, হ্যাঁ, তার সঙ্গে প্রথম জাহাজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেও বাঙালী। ঋষিকেশ তার নাম—ঋষিকেশ চন্দ বোধ হয়। আমরা ডাকতাম 'ঋষি' বলে। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু তখন অর্থাৎ প্রথম প্রথম যখন বাঙালী হিন্দুর ছেলেরা জাহাজে খালাসী হয়ে ঢুকতে লাগল, সারেঙ আর খালাসীর দল ভাল মনে সেটা নিতে পারে নি, তখন অপমান আর অবহেলা নিত্য সঙ্গী ছিল আমাদের। আর অযথা পরিশ্রম। তার কাহিনী না শোনাই ভাল। দরকার হলে, সারেঙ বা টিণ্ডেলদের সঙ্গে বন্দরে-বন্দরে নিষিদ্ধ পল্লীতেও যেতে হত। অন্য কিছু নয়, তাদের অনুচর হিসাবে, দেহরক্ষীরূপে। ঋষি মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। আমি ওকে সামলে রাখতাম। বলতাম, ধৈর্য, পড়াশুনা আর পরীক্ষাই আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু জাহাজ তো অধ্যয়নের বা তপস্যার ক্ষেত্র নয় ফায়ারম্যান হিসাবে। তাই যা কিছু করতাম, তা লুকিয়ে লুকিয়ে। লোকে পাপ লুকোয়, আমরা লুকোতাম—পুণ্য। আমি অনাথ ছেলে, মামাবাড়িতে অনাদরে মানুষ। ও তা নয়, ওর মা ছিল। কিন্তু তার কথা দু-একবার উল্লেখ করা ছাড়া আর-কিছু বলে নি—মনে হত, মায়ের প্রসঙ্গের প্রতি ওর এক অভাবিত বিতৃষ্ণা আছে।

ছিলাম আমরা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ফার্স্ট টিণ্ডেলের তা সইল না, সে ওকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সব সময় ভিন্ন ভিন্ন ডিউটিতে রাখত। এমন কি ওর শোবার জায়গাও সরিয়ে দিল আমার কাছ থেকে দূরে, অন্য জায়গায়। অবশ্য তাতেও তেমন-কিছু আসে-যায় না। কিন্তু দিনে দিনে যা দেখতে লাগলাম, তা হল ওরই এক ভিন্ন-তর মানসিক অবস্থা। পড়াশুনায় তেমন মন নেই, ফার্স্ট টিণ্ডেলের পিছন পিছন যায়, বন্দরে জাহাজ লাগলে তারই সঙ্গে ঘুরতে বেরোয় বেশী, চলনে বলনে রীতিমত 'জলচর' হয়ে উঠেছে বলা যায়।

একদিন ওকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, করছিস কী তুই ঋষি?

ঠোঁট উল্‌টে বললে, কী করছি!

বললাম, কোথায় যাস্‌ তুই টিণ্ডেলের পিছন পিছন?

বাঁকা একটু হেসে বললে, তুমি কাল কোথায় গিয়েছিলে সারেঙের সঙ্গে? আমি জানি না, না?

বললাম, তা বলে তোর মত···

বললে, তোর মত কী? বল্‌? কথার জবাব দে? মদ খেয়েছি একটু? বেশ করেছি। না খেলে, ও আমাকে আস্ত রাখত? খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলত না?

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওর সামনে, মাথা নিচু করে। বলার নেই, করারও নেই কিছু। সে যে কী দুর্বিষহ যাতনা, তা বলে বোঝানো যাবে না। এক, পালানো জাহাজ থেকে। কিন্তু কোথায়? এক জাহাজ থেকে পালিয়ে আর-এক জাহাজেই যে যাওয়া হবে! সর্বত্রই তো জাহাজের মত গণ্ডী। সেই গণ্ডীতে যে একটু ক্ষমতাবান, সে দুর্বলকে প্রহার করছে, কোথাও বা দেহে, কোথাও বা মনে। এই নিষ্ঠুর সত্য সেই বয়সেই জেনেছিলাম আমরা।

ক্রমে ক্রমে অনেক-কিছু সহনীয় হয়ে এল আমাদের। দুজনের দেখা হয় কম, কিন্তু যেটুকু দেখা হয়, তারই মধ্যে কথা হয়ে যায় আমাদের, প্রতিজ্ঞা যেন না ভুলি। পাস করে করে বড় হতে হবে আমাদের। আর, কাজ শেখা? তার জন্য সারেঙদের সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লী তো ভাল কথা, ওদের পা টিপতেও রাজী আছি।

এসব বর্ণনা করে বিশেষ লাভ নেই। বাহুল্য মনে হবে।

একদিন ওকে বললাম, এই, ফার্স্ট টিণ্ডেল তো এখন তোর হাতের মুঠোয়। ওকে বলে আমার ঘরে আমার পাশের ব্যাঙ্কে আবার ফিরে আয় না?

ঋষি বললে, আমিও সে কথা ভাবছি কদিন ধরে। বোধ হয়, রাজী হবে। দেখছিস না, তোকে-আমাকে বেশীক্ষণ কথা বলতে দেখলে আজকাল আর কিছু বলে না।

কেন বল্‌ তো?

ও একটু হেসে বললে, তুই যে সারেঙের পেটোয়া।

হেসে উঠলাম। ওর হাত ধরে বললাম, মনে থাকে যেন। ওদের ভজিয়ে-ভাজিয়ে যেমন করে হোক, সব কাজ শিখে নিতে হবে। উন্নতি নিশ্চয়ই করতে হবে জীবনে।

নিশ্চয়ই।

তারপর সত্যিই আবার একদিন ও আমার কেবিনে ফিরে এল। এবং শুধু তাই নয়, জাহাজ যাবে কলকাতা থেকে কলম্বো—নির্বাপিত ফার্নেসে প্রথম আগুন দেবার একস্ট্রা ডিউটি পড়ল আমাদের দুজনেরই একসঙ্গে। মহা আনন্দে দুজনে ফায়ারম্যানদের সঙ্গে একেবারে হাত মিলিয়ে কাজ করতে লাগলাম সেদিন। ফায়ারম্যানরা প্রত্যেক ফার্নেসের 'ফায়ার গ্রেটিংস্'-এ আধ ফুট উঁচু করে কয়লা সাজিয়েছে। আমরা তারপরে, মাঝখানকার ফার্নেসের দরজার কাছে কিছু বড় কয়লার খণ্ড সাজালাম এস্কিমোদের বরফ-ঘর সাজানোর মত করে। দিলাম কিছু কাঠ-কুটরো আর তেলেভেজা কটন্-ওয়েস্ট। অর্থাৎ, যেমন হয় আর কী, তেমনি করে আগুন জ্বালালাম বয়লারে। ফার্স্ট টিণ্ডেল আর সারেঙ—দুজনকেই দেখলাম খুব খুশী আমাদের ওপর।

এর দুদিন পরে যখন আমরা কলকাতার পাইলটকে বিদায় দিয়ে হুগলী পয়েণ্ট আর লাইট হাউস ছাড়িয়ে সমুদ্রে অনেকটা দূর চলে এসেছি, একস্ট্রা ডিউটিতে নীচে আমাদের দুজনকেই ডেকে নিয়ে গেল ফার্স্ট টিণ্ডেল।

সব-কিছু চেক্-আপের পর, গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যখন ব্লোয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে একটু হাওয়া খাচ্ছি, টিণ্ডেল এল একটা বড় মগে এক মগ চা নিয়ে। বললে, খাপ বার কর।

'খাপ' অর্থাৎ 'কাপ'। এনামেলের দুটো কাপ নিয়ে এল ঋষি, বললে, দাও।

টিণ্ডেল বললে, এস, একটু বসি।

তিনজনে চা খেতে-খেতে গল্প করছি। টিণ্ডেল কী মেজাজে ছিল কে জানে! তার জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করল। সে-সব নানান দেশের

নানান মধুরতার কাহিনী। ঋষি শুনে খুব হাসছিল। ঋষি আজকাল অবশ্য খুবই হৈ-হৈ করে। হাসতে-হাসতে একে চাপড় মারে তাকে চাপড় মারে। এখনও তাই করছিল।

বলে উঠছিলাম, উঃ! করছিস কী?

মিঞাসাহেবের গল্প শুনছিস?

টিণ্ডেল পান-খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল, বললে, ফাঁচ-ফাঁচবার সাদি করছি। ফাঁচ-ফাঁচটা বন্দরে। হাঁ। কত আর শুনবা, বলো?

বলেই হঠাৎ ঋষির একটা হাত ধরে মারল টান, বললে, তোমার সেই হুরীর খবর কী?

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, হুরী!

ঋষি একটু লজ্জাই পেয়েছিল বোধ হয়। আমতা-আমতা করে বললে, মিঞাসাহেবের রসিকতাও বুঝতে পারছ না? হুরী, মানে—

বাধা দিয়ে টিণ্ডেল বললে, হুরী মানে—জরু। সাদি করবে মেয়েটারে। এবার কলকাতায় চিঠি পেয়েছ না?

প্রশ্ন করলাম, কে মেয়েটা? কার চিঠি পেয়েছিস ঋষি?

মিঞা ওকে বললে, দোস্তকেও বল নি? বলেছে, আমারে বলেছে। জাহাজ তো সেই হুরীর ছাশেই যাচ্ছে।

হুরীর দেশ মানে?

টিণ্ডেল বললে, মোদের কাছে কলম্বো, ওর কাছে হুরীর ছাশ! বুঝলে না? ওর হুরী যে সেখানে! বলেই হি-হি করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ওরই গায়ে চিমটি কেটে বললে, পেরানটা না পাখি হয়ে যায়!

ততক্ষণে প্রাথমিক লজ্জাটা কাটিয়ে উঠেছে ঋষি, বললে, তোকে বলব-বলব করে বলা হয় নি, মানে—

বড় অদ্ভুত লাগছিল পরিবেশ। গম্ভীর মুখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়ানো মাত্র ও আমার হাত দুটো ধরে আবার বসিয়ে দিলে, বললে, রাগ করিস নি। এবার তোকে দেখাব। আলাপ করিয়ে দেব। আরে, বিয়েতে তুই-ই তো হবি সাক্ষী! দেখিস, ভারি মিষ্টি মেয়ে!

টিংগেল তখনও হাসছে, বললে, আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিও দোস্ত।

ঋষি বললে, আমায় মনটাকে বুঝে দেখ্। সত্যিই পাখির মত উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে।

বললাম, কিন্তু এসব আমাকে একটুও জানাস নি?

জানাবার সময় পেলাম কই? তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঋষি, সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! মিঞাসাহেব জানে, তুই জিজ্ঞাসা কর্।

টিংগেল বললে, দোস্তকে তুমিই সব বলো। বোস। এই নাও, এক-একটা করে কাঁইচি খাও। কলকাতার কাঁইচি। পাঁচ আনা পয়সা দিয়া নগদ কিনছি।

বলতে বলতে আমাদের দুজনের হাতে দুটো সিগারেট এগিয়ে দিল। আমি দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে সেই কাঠিতেই আমারটা আর মিঞাসাহেবেরটা ধরিয়ে তারপর জ্বালিয়ে দিলাম ঋষির সিগারেট। প্রথমটায় কারুরই খেয়াল হয় নি, কয়েকটা উপর্যুপরি টান দিয়ে হঠাৎ ঋষি নিজেই লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। সিগারেট ঠোঁট থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়াল, বললে, সর্বনাশ হয়েছে!

তারপরে এগিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে-পিষে নিবিয়ে ফেলল সিগারেটটা।

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে আমরাও। বললাম, কী হল?

কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে গেল, ঋষি বললে, এক কাঠিতে তিনবার ধরালে, তিনের লোকটি মরে যায়। জান না?

বলে মুখটা ঘুরিয়ে স্টোক্‌হোল্ডের অপর প্রান্তে চলে গেল সে।

মুহূর্তে সব সুর যেন কেটে গেল মনে হল। টিংগেলও একটুক্ষণ উসখুস করে তারপরে কাজের অজুহাতে চলে গেল অন্য দিকে। আমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ঋষির। বললাম, এসব সংস্কার মাথায় ঢুকিয়েছে কে?

মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে মুখটা ফেরাল আমার দিকে, বললে, জাহাজে কে আবার কাকে কী শেখায় ?

বলে পুনর্বার সরে গিয়ে পকেট থেকে দস্তানা বার করে, সে দুটো পরে পোর্টসাইড বয়লারের ফার্নেস-ডোরটা খুলে গনগনে আগুনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল, তারপরে দরজাটা বন্ধ করে দস্তানা পকেটে রেখে ব্লোয়ারের হু-হু হাওয়ার নীচে গিয়ে মাথা পেতে দাঁড়াল।

কাছে গেলাম, কোমলকণ্ঠেই বললাম, সিলোনীজ মেয়েটার নাম কী ? কবে, কীভাবে আলাপ হল তোর সঙ্গে ?

কোনও উত্তর না দিয়ে সরে গেল সেখান থেকে। স্টারবোর্ড বাঙ্কারের দরজায় দাঁড়িয়ে কালো-কালো কয়লার পাহাড়ের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি আমার ওয়াচে ফিরে গিয়ে বয়লারের প্রেসারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কাজ শেষ করে আবার একসময় গেলাম ওর কাছে। ও তখন স্টোকহোল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

বললাম, হঠাৎ হল কী তোর, ঋষি !

ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, কী হল বুঝতে পার না ? জাহাজ পৌঁছবে না কলম্বো।

শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে ঃ বলছিস কী অলুক্ষুণে কথা ! জাহাজ বে অফ বেঙ্গলে। এ সমুদ্রকে কেউ কখনও বিশ্বাস করে না। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটাতে পারে।

হিংস্র শ্বাপদের মত আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল, মরতে হলে একা মরব ভেবেছ ? সবাই মরব। একসঙ্গে।

এবার একটু জোরে ধমকেই উঠলাম ওকে, বলছিস কী সব পাগলের মত !

বললে, জাহাজ না ডুবলে, মরব কী করে? আর জাহাজ ডুবলে সবাই ডুববে। বুঝতে পারলে, কী সর্বনাশ হতে চলেছে ?

বললাম, তুই আমার সঙ্গে ঘরে চল্।

বললে, সবে এগারোটা দশ। ওয়াচ শেষ হতে এখনও পঞ্চাশ মিনিট।

আর কোনও কথা হয় নি ওয়াচের ঘণ্টা পর্যন্ত। একসঙ্গেই ফিরলাম ঘরে। চারজনের সীট্। দুজন ফায়ারম্যান আর আমরা। এই দুজন ফায়ারম্যানের রাত বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ডিউটি পড়েছে। অতএব রাত্রিটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

ও কিন্তু হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এল না। লক্ষ্য রেখেছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, অ্যালি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চার নম্বর পাঁচ নম্বর হ্যাচ্ পার হয়ে আফ্‌ট পার্টের ছাদে গিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। আশেপাশে ছিল না ক্রুদের কেউ। পিছনের জলরেখার দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঋষি। বললাম, আমি অত না ভেবেই দেশলাইয়ের কাঠিটা এগিয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস কর্, ওর মধ্যে আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

মুখ ফেরাল আমার দিকে, বললে, উদ্দেশ্যের কথা আমি বলি নি।

কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলেই বলে উঠলাম, তবে এসবের অর্থ কী? কী ব্যবহার করছিস আমার সঙ্গে, তা একবার ভেবে দেখ্!

কোনও উত্তর দিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কী-যেন দেখতে লাগল। একসময় বললে, সুরেশ!

কী?

বললে, আকাশে মেঘ-মেঘ করেছে না?

কই! কোথায়?

ওই কোণের দিকে তাকিয়ে দেখ্।

বললাম, দূর! আকাশ একেবারে ঝকঝকে। সমুদ্রও খুব শান্ত।

বললে, কিন্তু ঝড় উঠবে। আমি বললাম, দেখে নিস, আজ নয় কাল।

জাহাজ কলম্বো যাবে না। বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পিছন-পিছন গেলাম আমিও।

ঘরে এসেই ও শুয়ে পড়ল। পাশে গিয়ে বসলাম। আপত্তি করল না। একটুক্ষণ পরে বললাম, মেয়েটির নাম বলবি না ?

হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা বলে উঠল। বললে, কেন ? আমি মরলে মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ?

যেন চাবুক খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুমো তুই আজ।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর চারটেয় ফায়ারম্যান দুজন ফিরে আসার পর ঘুম ভাঙল। আটটায় ডিউটি আবার আমাদের। যাকে বলে—ফোরনুন ওয়াচ—সকাল আটটা থেকে বারোটা। আর একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু ঘুম এল না। উঠে দেখি, বিছানায় ঋষি নেই।

দেখা হল ভোর ছটার পর—মেস্-রুমে। চমকে উঠলাম চেহারার অবস্থা দেখে। সারাটা রাত যে ঘুমোয় নি, বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা হলেও মাত্র একটা রাত্রির জাগরণে মানুষের চেহারা যে এমন ভেঙে পড়তে পারে, এ ওকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বললাম, কোথায় ছিলি ?

তেমনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, তাতে তোমার কী ? সবেরই কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

শুধু আমি নয়, ঘরের অন্য লোকগুলি পর্যন্ত চমকে উঠল ওর কথায়। কেউ কেউ কিছু মন্তব্যও করে বসল। ও কোন রকমে চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল। ভাল করে খাবারটাও খেল না পর্যন্ত।

স্টোক্‌হোল্ডে ডিউটিতে এসে ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই নি। একটা বয়লারে স্টীম-প্রেসারের তারতম্য হচ্ছিল, একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বারোটা পর্যন্ত ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম।

বারোটার পর দেখা হল ফিরে এসে, ঘরে। বললাম, খেয়েদেয়ে ঘুম দাও দেখি। এভাবে থাকলে যে সত্যিই মরে যাবে !

কালির বৃত্ত আঁকা চোখ দুটি তুলে ধরল আমার দিকে, বললে, মরক যে, তা কি তুমি বুঝতে পার নি ?

ঘরে আর-কেউ ছিল না। এগিয়ে গিয়ে দু হাতে ওর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, বল্, আমি কী করেছি? সেই থেকে এরকম ব্যবহার করছিস কেন?

দুটি চোখ বুজে ফেলল। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে দুটি গালের ওপর নেমে এল চোখের জলের দুটি ধারা!

মুহূর্তে কোমল হয়ে এল আমার মন। বুঝলাম, ও সংস্কার ওর বুকে চেপে বসে আছে। টলানো যাবে না।

আস্তে ডাকলাম, ঋষি!

দুটি হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ওর বিছানায়। বললে, জাহাজ যদি না-ও ডোবে, তবে বয়লার বার্স্ট করবে। একটা কিছু হবেই।

বাজে কথা! কিচ্ছু হবে না।

নিশ্চয়ই হবে। আমার মন বলছে। আমার বুকের ভিতরটা কীরকম ধড়ফড় করে উঠছে মাঝে মাঝে, তা জান?

বললাম, সে তুমি সারারাত ঘুমোও নি বলে। সারারাত যা-তা ভেবেছ বলে। দুর্বল বোধ করছ তো?

বললে, করছি। কলম্বো কবে পেঁছিনোর কথা?

আরও চার দিন আছে।

বললে, এই চার দিন। বড়জোর এই চার দিন আমার আয়ু।

ফের বাজে কথা!

বললে, না সুরেশ। তবে মনে হচ্ছে, তোমাদের কিছু হবে না। ঝড় হলেও তোমরা বাঁচবে। হয়তো ডেকের ওপর ভেঙে-পড়া ঢেউয়ে আমি ভেসে যাব কুটোর মত।

বললাম, পাগল! ঝড় যদি ওঠেও, তোমার ডিউটি থাকবে কোথায়? ডেকে নয়। ইঞ্জিন রুমে। সুতরাং ভাসবে কী করে?

বললে, তা হলে বয়লারে এক্সিডেন্ট হবে। আমি পুড়ে মরব।

তাও হবে না।—বললাম, বয়লারে এক্সিডেন্ট হলে তুমি একা যাবে না, বহু লোক যাবে।

তা হলে?

বললাম, তা হলে—কী ?

অস্থিরভাবে বলে উঠল, কিন্তু তা হলে আমি মরব কেমন করে ?

বললাম, মরবে কেন তুমি ! দেখ ঋষি, স্কুলে তুমিও উঁচু ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলে, লেখাপড়া জান, তুমিও কি বুঝতে পারছ না, এটা কত বড় কুসংস্কার ?

বললে, তাই যদি হবে তো আমার মন এমন করে কেঁদে মরছে কেন ?

কী যেন বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ টিণ্ডেল ঘরে এসে পড়ায় ওকে আর কিছু বলা হল না। যা বলবার টিণ্ডেলকেই বললাম সব। টিণ্ডেলকেই কাছে ডেকে নিয়ে বললাম সমস্ত কথা।

মনোযোগ দিয়ে সবই শুনল টিণ্ডেল, কিন্তু তেমন কিছু ভরসার কথা বললে না, কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

এ-ও আশ্চর্য ব্যাপার ! পিছন পিছন বাইরে এসে বললাম, কী হল ? উঠে এলে যে ?

টিণ্ডেল বললে, সুবিধার মনে হচ্ছে না। মরতে পারে। মরণেই ধরেছে ওকে। সারেঙকেও বলেছি। সেও বললে, একই কাঠির আগুনে তিনবারের বার বিড়ি-সিগ্রেট্ খেলে লোক বাঁচে না। এটা সবাই জানে। ভাল কথা, অফ্‌সরদের কানে যেন না যায়। বাড়িওলা ভারি ধার্মিক লোক, শুনলে ওকে নিয়ে কী করবে কে জানে ? জলে ফেলে দেবার হুকুম দেয় যদি ? আগে আগে কত হয়েছে এমন।

বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম ওর কথা। ভাবছিলাম, তা হলে কি এ সংস্কারের পিছনে কোন অলৌকিক ব্যাপার আছে ?

'বাড়িওলা' অর্থাৎ ক্যাপ্টেনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা আমার নেই, তবে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যেতে পারি। তাঁকে কি সব কথা গিয়ে খুলে বলব ? যদি হিতে বিপরীত হয় ?

এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিনের ওয়াচও কেটে গেল। রাত বারোটার পর আবার আমরা এলাম আমাদের ঘরে। দুজনেই শুধু আছি, আর দুজন ডিউটিতে। দেখি, চেহারা যেন আরও খারাপ হয়ে গেছে। বললাম, খাওয়া-দাওয়া করেছিস তো ?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল, বসেছিলাম। খেতে পারলাম না। যেন বমি ঠেলে আসছিল।

বলে নিজের টিনের সুটকেসটা বার করে চাবি লাগিয়ে খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে কী যেন খুঁজে বার করে বাক্স আবার বন্ধ করে আমার কাছে এল। বললে, দেখ দেখি ফোটোটা? পছন্দ হয়?

ওর হাত থেকে ফোটোটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলাম। ছাপা শাড়ি-পরা তরুণী একটি মেয়ের ফোটো। হাসি-হাসি মুখখানা, মোটামুটি সুশ্রী বলা যেতে পারে। ফোটো দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়, গায়ের রঙ খুব ফরসা নয়।

ফোটোটা দেখে ফেরত দিতে যাচ্ছি ওর হাতে, মুখ তুলে চেয়ে দেখি, সরে গিয়ে ও ওর বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। উঠে ওর বিছানায় ওর কাছে গিয়ে বসলাম। চোখ বুজে আছে। বাস্তবিকই মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের চারিদিকে কালির বৃত্তটা আরও গাঢ় হয়েছে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে গাল দুটো ভেঙে পড়েছে। অদ্ভুত মায়া হতে লাগল ওকে তখন ওভাবে দেখে। কোমল কণ্ঠে ডাকলাম, ঋষি! এই নে তোর ছবি। চমৎকার মেয়ে, তুই ভাগ্যবান।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল, বললে, আমার সুটকেসে আর-কিছু নেই। গোটা কতক প্যান্ট্ আর শার্ট। দামী কিছু নেই। সারা জীবনে জমাতেও কিছু পারি নি। এই হাতঘড়িটা, তাও দামী নয়। দামী জিনিসই জীবনে পাই নি। আমার নিজের মা আমাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখতে পারে নি।

বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল, চোখ দুটি উঠল ছলছল করে। বললে, বাবা ভাল লোক ছিল না। মদ খেত আর রাত্রে এসে মাকে মারত। শেষে নিজেই লিভারের রোগে মারা গেল। কিন্তু বাবাকে মা মনে মনে ঘৃণা করত বলে আমাকেও দেখতে পারত না। কাকা-জ্যেঠাদের সংসারে সবার মন জুগিয়ে চলত মা, আর উদয়াস্ত খাটত। কাকী-জ্যেঠীদের সঙ্গে মিশে আমার ওপরও নির্যাতন করত। এই তো জীবন আমার সুরেশ, কিছুই নেই, মনে রাখার মত ছোটবেলার

কোনও সুখের স্মৃতিও নেই। আছে ওই ফোটোটা। না চাইতেই নিজের হাতে ও আমাকে দিয়েছিল। ওর মত মূল্যবান জিনিস আমার জীবনে আর-কিছু নেই। তাই মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখে তার সব থেকে প্রিয় জিনিসটিকে সবার চোখের আড়াল থেকে, তেমনি এটির কথাও কাউকে কোনদিন বলি নি, কাউকে কোনদিন দেখাই নি। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে দেখতাম, নিজেই সবার আড়ালে পাগলের মত কথা বলতাম ছবিটার সঙ্গে। আমার জীবনের সব থেকে দামী জিনিসই আজ তোমাকে দিচ্ছি সুরেশ, ওটা তুমি রেখে দাও তোমার কাছে। আমি নিয়ে করব কী? আমার দিন শেষ হয়ে গেছে।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ওর হাত দুটো ধরে বললাম, যেমন করে হোক তোকে বাঁচাব। রাখ্ তোর ফটো তোর কাছে।

না না।—ঋষি বললে, বাঁচাতে আমাকে পারবে না। কিন্তু বলছ কী? ছবিটা তুমি নেবে না!

ওর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ন-না, তা আমি নিচ্ছি। দাঁড়াও, রেখে আসছি আমার বাক্সে।

বলে বাক্সে ছবিটা রেখে সোজা তখ্খুনি ছুটে গেলাম চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। বৃদ্ধ লোক, জার্মান। যুদ্ধের পর বহু জার্মান অফিসার ভারতীয় জাহাজে চাকরি নিয়েছিলেন, ইনিও তাঁদের মত একজন। ওঁকে যতটা গুছিয়ে পারি, বললাম। শুনে বললেন, ভয়ানক কথা। ওকে নেক্স্ট্ পোর্টেই ছেড়ে দিতে হবে। বেচারা সত্যিই মারা যেতে পারে। তা ছাড়া, এক কাঠিতে তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতেই বা গেল কোন্ আহাম্মক? পৃথিবীসুদ্ধ সেলাররা যেটা জানে আর মেনে চলে, তা সে জানে না? তাকে ধরে চাবকানো উচিত।

দ্রুত সরে এলাম চীফের কাছ থেকে। 'উচিত'ই মাত্র নয়, সত্যিই যেন চাবুক দিয়ে আমাকে প্রহার করা হল সেই মুহূর্তে। সর্বাঙ্গে যেন এক দুর্বিষহ জ্বালা। ফোরক্যাস্‌লে পিক্‌ট্যাঙ্কটা দেখবার অছিলা করে নীচে নেমে গিয়ে বসে রইলাম নিভৃতে একা—কিছুক্ষণ। মনে

হল, তবে কি আমিই দায়ী? তবে কি এ মাত্রই সংস্কার নয়? এর মধ্যে সত্যি কিছু আছে? সত্যিই তা হলে মরে যাবে ঋষি?

ন-না, হতে পারে না। নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলাম। তারপরে ছুটে এলাম বাইরে। তাকালাম চারিদিকে। নীল সমুদ্র, শান্ত আর স্থির। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আকাশের কোন কোণে কোন কালো মেঘ নেই। হালকা মেঘের সাদা ভেলা দিগন্তে ভিড় করে আছে শুধু!

ছুটতে ছুটতে ঘরে এলাম ফিরে। দেখলাম, সেই একই ভাবে শুয়ে আছে ঋষি। ঘুমুচ্ছে না, চোখ দুটি খোলা, তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে।

আস্তে ডাকলাম, ঋষি!

যেন চমকে উঠল মুহূর্তে, বললে, কে? ও তুমি?

হ্যাঁ, আমি। কাছে গিয়ে বললাম, মন থেকে মুছে ফেল্ সব। মনে কর্ কিছুই হয় নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলি শুধু।

দুঃস্বপ্ন! বলে একটু হাসল, ঠোঁটের কোণে কষ্টে-টেনে-আনা ম্লান একটু হাসি। বললে, দুঃস্বপ্নই বটে!

বললাম, চীফের কাছে শুনলাম, তোর যে অবস্থা, তোকে ওরা কলম্বোতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। শাপে বর হবে, কী বল?

একটু যেন আগ্রহ দেখলাম ওর মধ্যে। বললে, ঠিক বল্ছিস! কলম্বোতে নামাবে আমাকে?

হ্যাঁ রে।

পরক্ষণেই যেন সব আগ্রহের জ্যোতি ওর নিবে গেল, বললে, কিন্তু তার আগেই আমি শেষ হয়ে যাব। আমি জানি। আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

বললাম, মেয়েটির নাম কী রে?

বললে, কমলা।

কমলা!—সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, এ যে একেবারে বাঙালী নাম!

ধীর, শান্ত আর স্তিমিত কণ্ঠে বললে, বাঙালীই সে।

বলিস কী! কলম্বোতে বাঙালী মেয়ে?

হ্যাঁ। টিগুেল জানে, ওকে সেদিন বলেছিলাম সব।

ঋষি বললে, গত বার কলম্বোতে আলাপ। তারপর চিঠি লেখালেখি। হ্যাঁ, ভাল কথা, চিঠিগুলোও তুমি নাও ভাই। একতাড়া চিঠি। ওই বাক্সের কোণটাতে আছে। চাবির দরকার নেই, বাক্স খোলাই রেখেছি। কই, নিয়ে এস।

ও যাতে ব্যথা না পায়, সেই বুঝে উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম চিঠিগুলো। একটা সুতোয় বাঁধা—যত্ন করে রাখা—একগোছা নীল খাম। ওর শিয়রে এনে রাখতেই, তার ওপরে সস্নেহে হাতখানা বুলোতে বুলোতে বললে, পরে অবসরমত পড়ে নিও। সব জানতে পারবে। এইবারই আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

বললাম, আমিও বলছি, হবেই এ বিয়ে। আমিই হব সাক্ষী।

ম্লান হাসলো: আমার জীবনটাই এমনি। পেয়েও পাই না। ভেবেছিলাম, কিছুই তো দেয় নি ভাগ্য, বোধ হয় এইবার একটু আলোর রেখা দেখলাম। কিন্তু সেও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেল। তাকে পাব না। কিছুতেই পাব না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে, সুরেশ!

কী?

বললে, ছোট্ট একটা ঘরে সে থাকে। চিঠিতেই তার ঠিকানা আছে, তুমি গিয়ে দেখা কোর। বড় ভাল মেয়ে। একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে।

বললাম, বাঙালী মেয়ে ওখানে গেল কী করে?

বললে, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। আমি টিগুেলের সঙ্গে নিষিদ্ধ এক পল্লীতে গেছি। গা ঘিনঘিন করে গলির চেহারা দেখলে। আমাকে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেল। পরে ফিরে এসে বললে, তুমি যাও। আমি রাতটা এখানে থাকব। সারেঙকে বলে ভোরবেলা এখানে এস। এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি চলে এলাম। রাবে সন্ধ্যা হয়েছে।

ভাবলাম, এখনই ফিরব কি জাহাজে? একটু বেড়িয়ে যাই। ঘুরতে ঘুরতে বড় রাস্তায় এলাম। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক প্রান্তে চলে এসেছি। হঠাৎ একটা বইয়ের স্টলে খান দু-চার বাংলা বই নজরে পড়ল। সে যে কী আনন্দ, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না! এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইগুলি উলটে-পালটে দেখছি। কতক্ষণ ধরে দেখছি তার ঠিক নেই, হঠাৎ কানে এল মেয়েলী এক কণ্ঠস্বর, বইগুলো দেখা হয়েছে কী?

কণ্ঠস্বরে যতটা না চমকে উঠলাম, ততোধিক চমকে উঠলাম কলস্বোতে বাংলা ভাষার উচ্চারণ শুনে।

দেখি, আমারই মত বইয়ের আকর্ষণে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন স্টলে।

আর বেশী কী বর্ণনা করব? এক কথায় মেয়েটির সঙ্গে এইভাবে আমার আলাপ। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার, পেটি রিপেয়ারের জন্যে জাহাজটা সেবার ওখানে ছিল প্রায় দিন দশেক। তাই না?

তা হবে।

বললে, এই দশ দিন রোজ তার সঙ্গে দেখা করেছি। তার অফিসও সে চিনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, যখন সুবিধা হবে, তখনই আসবেন। অফিস-টাইম হলে অফিস থেকে ছুটি নেব।

কিছুই না। দুজনে ঘুরে বেড়াতাম। অমন করে ঘোরার আনন্দও যে কত হতে পারে, তা যদি আগে জানতাম! অদ্ভুত মেয়েটির জীবন। বললে, কলকাতাতেই তার শৈশব কেটেছে। নারকেলডাঙায়। ছোট বেলাতেই মা মারা যায়। বাপ আর মেয়ের সংসার। বাপ সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতেন না, মেয়েকেও মিশতে দিতেন না। মিশতেন তিনি অবাঙালীদের সঙ্গে, তাঁর কারবারও ছিল অবাঙালীদের সঙ্গে। বলতেন, বাঙালীরা খুব যে স্বার্থপর তা নয়, কিন্তু এতবড় পরশ্রীকাতর জাত আর নেই।

মেয়েকে নিজে পড়াতেন বাড়িতে। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস

করিয়েছিলেন। কিন্তু ওই এক গোঁ। বাঙালীর সঙ্গে মিশতে দেবেন না, এমন কী বিয়েও দেবেন না বাঙালীর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিলেন এক সীলোনিজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ভদ্রলোক তখন কলকাতাতেই থাকতেন। কিন্তু বিয়ের পর কী জানি কেন, তাঁর মত বদলাল, চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে বউকে সঙ্গে করে চলে গেলেন একেবারে কলোম্বো।

তারপর?

ঋষি একটু থেমে থেকে তারপরে বললে, বছর দুই পরে সেই ভদ্রলোক একদিন তাড়িয়ে দিলেন বউকে। অন্য বিয়ে করলেন। নিঃসহায় মেয়ে। কেই-বা সাহায্য করবে? বিয়ে তো হয়েছিল কলকাতায় হিন্দুমতে, পুরুত ডেকে বাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মে বৌদ্ধ ভদ্রলোক সিলোনে এসে যদি সে বিয়েকে একদিন অস্বীকার করে বসেন, তুমি প্রমাণ করছ কোন্ দলিল দিয়ে?

কেন, বাপ?

ম্লান হেসে ঋষি বললে, এও অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়েকে ওভাবে বিয়ে দিয়ে দূরদেশে পাঠিয়ে বোধ হয় অনুশোচনা হয়েছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকেরাও বলত, মেয়ে-বেচা কশাই। তা টাকা তিনি নিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে, বেশ কিছু টাকা, কারবার বাড়াবার জন্যে। কিন্তু কী যে হল, কলকাতার পাট উঠিয়ে দিয়ে কোথায় যে গেলেন, তা কেউ জানল না। একদিন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেল, পুরীর সৈকতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকেটে চিঠি। তাঁর নাম-ঠিকানা। লেখা, আমার আত্মহত্যার জন্যে কেউ দায়ী নয়।

সোজা হয়ে উঠে বসেছি। বললাম, বলিস কী! এসব বানানো গল্প না তো?

না।—ঋষি বললে, তাকে দেখলে তুইও বুঝবি, মিথ্যে কিছু বানানোর মেয়ে সে নয়। আর তা ছাড়া, তাকে লেখা তার বাপের চিঠিগুলোও আমি দেখেছি। তীব্র অনুশোচনার সুর তাতে বেশ ধরা পড়ে।

তারপর?

ঋষি বললে, তারপর আর কী? কোনক্রমে ওর দিন কাটে সেলাই করে, ছেলে পড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটিং আর স্টেনোগ্রাফি শিখে অফিসের চাকরি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নেহাতই দৈব ছাড়া আর-কিছু নয়।

বললাম, তা, তাকে তো কলকাতায় নিয়ে আসতে পারতিস?

ঋষি বললে, বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব, কেমন? কিন্তু সে রাজী হল না। বললে, দেহে যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন বাংলা দেশ কেন, ভারতের মাটিও ছোঁব না।

একটু হেসে বললাম, হয়তো এ অভিমান।

হবে।—ঋষি বললে, মেয়েদের সঙ্গে কখনও মিশি নি। কিন্তু এমন মেয়েও কখনও দেখি নি। এত মিশেছি, কিন্তু কখনও প্রশ্রয় দেয় নি। বলেছে, ভালবাসতে শেখো, লক্ষ্মীটি। পাওয়ার পরে ভালবাসা নয়, ভালবাসার পরে পাওয়া। আমাকেও পেতে দাও তোমাকে তেমনি করে।

বলত, তোমার কাছে আমি আকর্ষণীয়, আমার কাছেও তুমি সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠ।

একদিন বললে, একটা ধবধবে ফরসা লোক আমাদের ফলো করে, লক্ষ্য করেছ?

না তো!

বললে, লক্ষ্য করে দেখো। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে তোমাকে।

কেন? দুষ্টু লোক?

না, তা ঠিক নয়।—বললে, আমাকে যে বিয়ে করেছিল কলকাতায়, সে আমাকে এখানে এনে তাড়িয়ে দেবার পর ওই লোকটাই আমার জীবনে আসে। সীলোনিজ খ্রীষ্টান। ভালবাসতে শুরু করল। তোমার কাছে সত্য গোপন করব না, আমারও ভাল লাগত তখন লোকটিকে। কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার পূর্বেই ও একদিন

জোর করে অধিকার করল আমাকে। ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠেছিল। ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই থেকে পরিহারও করে

হেসে সেদিন ওকে বলেছিলাম, তা হলে তোমার জীবনে আমি তৃতীয় ব্যক্তি, কী বলো ?

হাসতে গিয়েও হঠাৎ কী ভেবে হাসি আর হাসতে পারে নি। বরং কী এক অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় ম্লান দেখাচ্ছিল ওর মুখ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, না, কিছু না।

নিশ্চয় কিছু। বলবে না ?

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এদেশের এক জাতের মেয়েদের মধ্যে কী ধারণা আছে জান ? যদি কোন মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যে, পর পর দুজনের পর তৃতীয় পুরুষটির আবির্ভাব ঘটল তার জীবনে, তা হলে সেই তৃতীয় মানুষটি আর বাঁচে না।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। বলেছিলাম, যত সব কু-সংস্কার।

ও কিন্তু অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারে নি কথাটা। প্রথম দিকে খেয়াল করে নি, চৈতন্য হয়েছিল আমারই কথায়। আর যখন হল, তখন থেকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে থাকত।

এর পর আরও চার দিন ছিল আমাদের জাহাজ, অর্থাৎ ওই ঘটনার পর আরও চার দিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কথাটা সে মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারে নি, ওটা যেন কাঁটার মত বিঁধে ছিল তার মনে। বলেছিলাম, তুমি সেই জাতের মেয়ে নও, তোমার অত ভাববার কী আছে ?

বললে, না হলেও, সেই জাতের মেয়েদের সঙ্গে এক আকাশের নীচে বাস করি তো, একই বাতাসে নিশ্বাস নেই !

তারপরে একদিন নিজেই বললে, আচ্ছা, শোন। একটা কথা মনে হয়েছে। ও-লোকটা আমার জীবনে ধূমকেতুর মত এলেও ওকে তো

আমি ভালবাসি নি। অতএব, ওকে দ্বিতীয় পুরুষ ধরব কেন? দ্বিতীয় পুরুষ তুমি।

আর প্রথম পুরুষ?

বললে, যে বিয়ে করেছিল, সে। ভালবেসেছিলাম, সে কথা সত্যি।

তার কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে এসেছিল। দেখে-দেখে ভেবেছিলাম,—অত্যাচারীকেও মানুষ ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, শেষ দু দিন ওকে অতটা বিমর্ষ দেখি নি, ও যেন নিজের মনে-মনেই একটা সিদ্ধান্তে এসে পেঁাছেছে। কিন্তু বিপদে পড়লাম আমি নিজেকে নিয়ে। সীলোনিজ লোকটিকে ধরে আমি কিছুতেই নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাবতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমিই তৃতীয় ব্যক্তি, যে বাঁচবে না।

জানি এটা সংস্কার তবু অদ্ভুত মানুষের মন! এই যে কাঁটা প্রবেশ করল মনে, তাকে এই কয়মাস ধরে আর ওঠাতে পারি নি। চিঠি-পত্রে তার আভাস আছে। ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছে, বলেছে—আমার হিসাবে তুমি দ্বিতীয়।

কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। এইরকম যখন ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলেছে মনে, এমন সময় ঘটল ওই সিগারেটের ঘটনাটা। মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল সব দ্বন্দ্বের। বুঝলাম, অমোঘ এই বিধান। মৃত্যু আমার আসবেই। কলম্বো পেঁাছনোর আগেই যেমন করে হোক আমি শেষ হব। ওকে চোখের দেখাটুকুও আর দেখতে পাব না।

চোখ দুটো বুজল ঋষি। আবার তেমনি দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখের কোণ থেকে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলাম আমি। সারেঙের সঙ্গে দেখা করে ওকেও বললাম সব। বললে, টিণ্ডেল বলেছে, ও মরবে ঠিক। ওকে মরণে ধরেছে। জাহাজে ওরকম হয়। এক জাহাজে এ-রকমটা হয়েছিল। নিজের চোখে দেখা। এডেন থেকে জাহাজ ছেড়েছে। খুব গরম। লোহার রেলিংয়ে পর্যন্ত হাত দেওয়া যায় না, ফোস্কা পড়ে। ইঞ্জিন-রুম থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে এল, ঘামে তার পাজামা

আর গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। দেখতে-না-দেখতে, ধরতে-না-ধরতে 'আল্লা-হো-আকবর' বলে চিৎকার করে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরিয়ায়।

তোমরা বাঁচালে না?

কাকে বাঁচাব! কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের পিছনে কিছুটা জল টকটকে লাল হয়ে উঠল।

লাল কেন?

বললে,—জলে পড়ামাত্র হাঙরে ধরেছে আর কী?

সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মুহূর্তে। বললাম, কিন্তু ঋষির তা হলে কী হবে?

কী আবার হবে! চোখে-চোখে রাখতে হবে। এই রকমই ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায় মানুষ। তবে, যাই কর শেষ পর্যন্ত আটকানো যাবে না। আর-একটা জাহাজে একবার—

আমি আর শুনতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ওর কাছ থেকে। বুকের কাছটা কেমন মুচড়ে-মুচড়ে আসছিল। গলার কাছটাও যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে, যেন নিশ্বাস নিতে পারছি না। চোখের পাতা দুটোও ভিজে ভিজে আসছিল। এর জন্য যে আমি দায়ী—আমি দায়ী। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে দাও—যেমন করে হোক, ওকে বাঁচিয়ে দাও।

বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। শান্ত সমুদ্র। তাকালাম আকাশের দিকে। একটা কোণের দিকে—

ও কী! কালো মেঘের একটা খণ্ড।

হয়তো কিছু নয়, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে কেঁপে উঠল হঠাৎ। নামতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল টিণ্ডেলের সঙ্গে। তাকেই বলে ফেললাম আকাশের কথা। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে মেঘটাকে দেখল। বললে, ভাল ঠেকছে না। তুফান হবে। গাজী বদর-বদর!

দেখতে দেখতে ঘন্টাখানেকের মধ্যে, প্রগাঢ় কালো মেঘে ঢেকে গেল সমস্ত আকাশ। সমুদ্রও যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠল জেগে। ক্রিং-রি-রি-রিং শব্দে বাজতে লাগল ঘন্টা। সবাই ডিউটির জন্য হলাম প্রস্তুত।

ঋষি বললে, টিণ্ডেল এসে এক বোতল মদ দিয়ে গেছে—আর কিছু পাতিলেবু। ড্রাই জিন, নেবুর রস দিয়ে খেতে বললে। আমি মুখেও তুলতে পারলাম না। কী হবে? কেন নষ্ট করব নিজেকে শেষ মুহূর্তে? মরণ আসছে, ওর কাছে নিজেকে যখন সঁপেই দিতে হবে, পবিত্রভাবেই দিই। কত খারাপ ব্যবহার করেছি তোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সুরেশ, আমাকে ক্ষমা করিস।

বলতে বলতে গলা ওর ধরে এল, বললে, তাকে আর পাওয়া হল না। জীবনের একমাত্র কামনা ছিল তাকে পাওয়ার। হল না। তার মুখখানিও দেখা হল না শেষ সময়ে। যদি মরা দেহটা কোনরকমে পাস তো নিয়ে গিয়ে কলস্রোতে দাহ করিস।

চেঁচিয়ে উঠলাম, চুপ কর্ তুই ঋষি।

বললে, তুফান এসে গেছে। আর আমার মরণকে ঠেকায় কে?

হেসে উঠল পাগলের মত।

কিন্তু মাত্র ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাদের চলবে না, ঝড়ের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে প্রাণপণ। যার যেদিকে যেটুকু ক্ষমতা। যতক্ষণ ঝড় না থামবে, ততক্ষণ কী অফিসার কী খালাসী, কারও বিশ্রাম নেই মুহূর্তের জন্য। হয় জেগে থাকা আর বুদ্ধি স্থির রেখে যার যার কাজ করে যাওয়া, আর নয়তো জাহাজডুবি হয়ে সমুদ্রের অতল-তলে চির বিশ্রাম।

ডেক ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক পাগলের মত,—আর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম জাহাজের জঠর-প্রদেশে। ডেকের লোকেরা জাহাজডুবি হলে লাইফবোটের সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিন-রুমের আমরা কলে-পড়া ইঁদুরের মত মারা পড়ব অসহায়ভাবে। মুহুর্মুহু ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল সবাই, যে কোন মুহূর্তে প্রবল জলস্রোত ওপর থেকে নীচে এসে পড়তে পারে দুর্ধর্ষ প্রপাতের মত। আমরা ঘাড় ভেঙে মরতে পারি, আবার খাঁচায়-পোরা পাখির মত ছটফট করেও মরতে পারি। সারেঙ বললে, দরিয়ার অবস্থা ভাল নয়। পাহাড়ের মত সব ঢেউ উঠছে।

তামার ভয়েস-পাইপে ব্রীজ থেকে ইঞ্জিন-রুমে সব সময়ই ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আসছে। ইঞ্জিনের গতি-নির্দেশক ফলকের কাঁটা-টা 'অ্যাহেড-অ্যাস্টান'-এর মাঝে কাঁপতে কাঁপতে চরম গতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ জাহাজ চলছে এবার ফুল স্পীডে,—কোন্‌দিকে কে জানে!

কাজের ফাঁকে বেশ কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, স্টোকহোল্ডে স্টারবোর্ড-বয়লারের ওয়াচে দাঁড়িয়ে ঋষিকেশ। টিণ্ডেল বোধ হয় ওর ওপর মায়াপরবশ হয়েই হালকা কাজ দিয়েছে ওকে। কিন্তু দূর থেকে ওকে ওভাবে দেখে বুকের ভিতরটা কী-এক আশঙ্কায় ধক করে উঠল মুহূর্তের জন্য। বয়লারের ওয়াচে এখন খুবই সতর্ক থাকা উচিত। পূর্ণগতিতে জাহাজ চলছে, বয়লারের প্রেসারে না তারতম্য ঘটে! জাহাজের দুর্দান্ত আন্দোলনে অথবা বয়লারের 'ওয়াটার-লেবেল' খুব বেশী হয়ে, বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। অন্যমনস্ক থাকলে ওকে এখন চলবে না। ওর সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য জাহাজের এতগুলি প্রাণ না বিপন্ন হয়ে পড়ে! চড়া গলায় ডাকলাম, ঋষি!

চমকে কেঁপে উঠল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কী?

বয়লারে স্টিম-প্রেসার কত? ওয়াটার-লেভেল?

অপ্রস্তুতের মত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বয়লারের কাছে। দেখে এসে যা বললে তাতে বুঝলাম, সব ঠিকই আছে। বললাম, শোন। ভাবালুতার সময় এটা নয়। জাহাজের এতগুলি লোকের মরণ-বাঁচন। ওয়াচে কোনরকম গাফিলতি কোর না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় না ওর চেহারা। চোখ দুটো বসে গেছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, গলার হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু। শরীরও বেশ রোগা হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে, বৃথা চেষ্টা। বাঁচাতে পারবে না।

শোনামাত্র হিংস্র আক্রোশে ওর জামার কলারটা চেপে ধরলাম: ফের অমন অলক্ষুণে কথা বলবে তুমি?

কিছু বলল না, প্রতিরোধও করল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে

যাবার পর বলে উঠল, এক কাজ করলে বেঁচে যাবে তোমরা। আমাকেই ফেলে দাও জলে। আগেকার ক্যাপ্টেনরা যেমন নাকি করত অলুক্ষুনেদের নিয়ে। আমি অলুক্ষুনে—আমি অপয়া।

বলতে বলতে দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মত। বললে, কিছু পাই নি জীবনে। মরুভূমি। শুধু ওর ওই কয়েকদিনের সাহচর্য। কিন্তু সে যে বসে থাকবে আমার জন্য! সে স্থির জানে, আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি তাকে বিয়ে করতে। এই জাহাজে তার বর আসছে। কী হবে তখন? তুমি দেখা কোর। তিন সত্যি কর যে দেখা করবে?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি সরে এলাম ওর কাছ থেকে। এবং সেই যে সরে এলাম, আর কাছে যেতে পারি নি পুরো দুটো দিন, মানে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য। কিন্তু, মনে মনে বার বার বলেছি,—ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, ওকে বাঁচিয়ে রেখো। সংস্কার যে মিথ্যা, এর প্রমাণ যেন ওকে আমি দিতে পারি।

কেটে গেল আটচল্লিশ ঘণ্টা। ক্লান্ত পায়ে মুমূর্ষুর মত এসে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। আমার মত আরও অনেকে অসুস্থ হয়েছে। ওরই মধ্যে তাকিয়ে দেখি, ঋষি ওর বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু এ কী কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ওর!

ফায়ারম্যানদের কাছ থেকে শুনলাম, এই দু দিনে চার-পাঁচবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ও। ওষুধ-পত্র দিয়েছে এসে চীফ অফিসার আর স্টুয়ার্ড। ডিউটি থেকেও অফ করে দেওয়া হয়েছিল। কোন-ক্রমে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। মাতালের মত টলছি। বললাম, কেমন আছিস?

আমাকে দেখে আবার কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, বললে, কমলার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে তো? বলবে, আমি তাকে ভুলি নি?

তা কাঁদছিস কেন হতভাগা? করব, দেখা করব। একটিবারের জন্যও ভুলি নি।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে রাখল বুকের ওপর। বললে, বাঁচলাম।

জান, মরতে আমার দুঃখ নেই। কিছু পাওয়া যে আমার ভাগ্যে নেই, তা আমি জানি।

হাত ছাড়িয়ে সরে এলাম নিজের বিছানায়। তারপরে আর-কিছু মনে নেই। কে যেন বলেছিল, আমি একসঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম আটটি ঘণ্টা।

উঠে, বিছানায় তাকিয়ে দেখি, ঋষি নেই। ঘরে কেউই নেই। পোর্টহোল্ দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ওই ফাঁক দিয়েই দেখলাম, চক্রাকারে ঘুরছে সব সাদা সাদা সাগর-পক্ষীর দল। ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু, এ কী, কোন পোর্টে এসে লেগেছে নাকি? তবে কি কলম্বো? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেলুনে গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক। ঋষি টেবিলের সামনে বসে আছে চা-টোস্ট নিয়ে। ফরসা প্যাণ্ট আর শার্ট পরনে, মুখখানিও কামানো, চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কণ্ঠ তখনও দুর্বলতায় ক্ষীণ, বললে, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এস। তোমাকে আমাকে দুজনকেই এবেলা ছুটি দিয়েছে সারেঙ। কলম্বো এসেছি চার ঘণ্টা হয়ে গেল,—কলম্বো।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। তারপরে একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলাম মুহূর্তে। প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে, বেশ করে পেট ভরে খেয়ে ভাল কাপড়-জামা পরে বেরুলাম ওর সঙ্গে। চীফ বললে, এজেণ্টকে চিঠি দিয়েছে ক্যাপ্টেন। ওকে কলম্বোতে ছেড়ে যাব আমরা। ডাক্তার এসে ওকে দেখে গেছে, বলেছে,—খুব দুর্বল। ওকে 'সিক' করে দিয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, ভালই হল হতভাগা। বিয়ে করে দিনকতক কাটা শান্তিতে! কিন্তু দেখলি তো সংস্কার-টংস্কার সব বাজে।

ও কিছু বললে না, একটু হাসল শুধু।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আলাপ হল মেয়েটির সঙ্গে। আমিও বাঙালী শুনে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বেশ মেয়ে, কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কিছুক্ষণ কাটিয়েই ফিরে এলাম। আমি ফেরার ঘণ্টা দুয়েক পরে ও-ও ফিরল।

কী, রে এলি যে ?

বললে, ও যে অফিসে গেল। শোন সুরেশ, রেজিস্ট্রার ওর চেনা। কাল বিকেল পাঁচটায়, তোমার অফ থাকবে জানি, আমার সঙ্গে যাবে সাক্ষী হতে। কালই বিয়ে। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরি করতে চাই না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই হল। যথারীতি অনাড়ম্বর বিয়ে হয়ে গেল ওদের। কমলার ঘরখানা সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। গল্পে গল্পে খাওয়া-দাওয়ায় রাত হয়ে গিয়েছিল। টিণ্ডেল সারেঙ আর আমি উঠে এলাম। বললাম, আজ তোর ফুলশয্যা। চললাম। আমার কাল সকালে ছুটি আছে, ভোর হলেই আসব।

তারপরেই গলা নামিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, এসে শুনব সব।

লজ্জায় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা, হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারের মীমাংসা করতে পারছে না কমলা। আমি ওর জীবনের তৃতীয় ব্যক্তি আমি জানি। কিন্তু ও বলছে—দ্বিতীয়।

যাও!—বলে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল কমলা।

আমরা চলে এলাম। এ কাহিনী যদি এখানেই আমি শেষ করতাম, তা হলে ভাল হত রাইটার, কিন্তু তা তো হবার নয়। যিনি সকল কাহিনী, জীবন আর মনের নিয়ামক, তিনি এ কাহিনী আরও একটু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পরদিন সকালে যথারীতি ওদের ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা যে কোনদিন দেখব, তা কল্পনাও করি নি। দেখলাম, লোকজন ভিড় করে আছে বাড়িটাকে ঘিরে। দু-একটা গাড়িও।

বলতে হবে, সিংহলের রাজপুরুষেরা খুব নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। পুলিসের সামনে ডাক্তার লিখে দিতে দেরি করলেন না যে, মৃত্যু হয়েছে অকস্মিক হৃদস্পন্দন থেমে গিয়ে।

সারাটা দিন গেল মর্গ আর শ্মশান নিয়ে। সব শেষ করে এসে পরদিন যখন কমলার সঙ্গে দেখা করলাম, দেখি নিশ্চল প্রতিমার মত বসে আছে ও ঘরের এক কোণে।

কাছের একটা চেয়ারে আমিও গিয়ে বসলাম। কিন্তু কথা বলতে পারি নি অনেকক্ষণ। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের মত। বললাম, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমার শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু কেমন করে ঘটল এটা ?

যেন সমস্ত লাবণ্য ওর দেহ থেকে শোষণ করে নিয়েছে কেউ। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কমলা বললে, সে রাত্রে আপনি চলে যাবার পর ও যেন মেতে উঠল আমাকে নিয়ে। বলতে বাধা নেই, আমিও ধরা দিলাম। কিন্তু ডাক্তারসাহেব যা বললেন, তাতে বুঝলাম, সেটাই আমার ভুল হয়েছে। জাহাজে ওর যে অত মানসিক বিপর্যয় গেছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ও স্থিরই করেছিল, বিয়ে আমাদের হবে না। আমাকে ও পাবে না। কিন্তু সেই আমাকেই যখন আবার পেল, তখন সেই অতর্কিত পাওয়ার আনন্দের উচ্ছ্বাস ওর দুর্বল স্নায়ুতে ও সহ্য করতে পারল না। গল্প করতে করতে শেষরাত্রে এক সময় কেমন স্তিমিত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুম পাচ্ছে ? বললে—না, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। বাস্, সে-ই শেষ কথা। ডাক্তার এসেও কিছু করতে পারলেন না।

চুপ করল সুরেশ্বর দাস। আকাশ তখন ফরশা হয়ে এসেছে। কেউই কোনও কথা বলতে পারছি না। আমিও না, মহাদেবনও না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। জাহাজে সূর্যোদয় আসন্ন। আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। মহাদেবন বললে, মেয়েটির কী হল শেষ পর্যন্ত ?

কিছুই হল না।—সুরেশ্বর বললে, তারপরেও দুবার দেখা হয়েছে, সেই একই ভাব। সেই দিনকার সেই প্রস্তরমূর্তির মতই

লাবণ্য-ঝরা চেহা -দিনের পর দিন অফিসে কাজ কই ভাবে, কথা বললে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে। ঋষির সেই বিশ্বাস,—পেয়েও পাবে না। সেই বিশ্বাসের মত, তার জীবনেও যে কিছু-একটা হবে না, কমলা এটা স্থির বুঝে নিয়েছে এতদিনে।

খুঁজে-ফেরা আলো

রাত্রের অন্ধকারে সমুদ্র আর আকাশ যখন একাকার হয়ে যেত, সেই সময় বাতিঘরের খুঁজে-ফেরা আলো দেখতে দেখতে মনে হত, ওই যে আলোর রশ্মি সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে পড়ছে, ঘুরছে, আর সরে যাচ্ছে, ও শুধুই আলো নয়, যেন কার নিঃসঙ্গ মন, আর-এক মনকে অন্বেষণ করছে।

কী জানি কেন, আন্দামানের রস্‌দ্বীপে যে নিঃশব্দ বাতিঘরটি দেখেছিলাম, অন্ধকার রাত্রে তার সেই সেদিনকার খুঁজে-ফেরা আলোর কথাই নতুন করে মনে পড়ছে আজ। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে 'মহারাজা' জাহাজ ক্ষুদ্র রস্‌দ্বীপের ধার দিয়ে 'চাথাম' জেটিতে গিয়ে ভিড়েছিল। 'চাথাম'ও বলতে গেলে ক্ষুদ্র এক দ্বীপ, পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত।

সে আমার লেখক-জীবনের প্রথম অধ্যায়,—এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে আন্দামান গিয়েছিলাম। কোথায় আকুজী অ্যাণ্ড সন্স, কোথায় কৃষ্ণস্বামী অ্যাণ্ড সন্স, কোথায় গোবিন্দ রাজুলা অ্যাণ্ড কোং—এই সব ব্যবসায়ীদের সংস্রবে ব্যবসায়িক কথাবার্তায় দিন কাটে, মাঝে মাঝে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা লক্ষ্য করি। আর অবসরমত ঘুরে বেড়াই বার্ডস লাইন থেকে টেম্পল্‌ মাউ। কখনও বা রস্‌দ্বীপে। ব্রিটিশ আমলে এটাই ছিল চীফ কমিশনার ও বড় বড় অফিসারদের থাকবার জায়গা। অধুনা পরিত্যক্ত বলা চলে। পাওয়ার হাউসটি আছে শুধু, আর আছে বাতিঘর।

অবশ্য, ঠিক এখন কী অবস্থা হয়েছে জানি না, আমি যখন গিয়েছিলাম তখনকার অবস্থা ছিল এই। বড় ভাল লাগত নির্জন রস্‌দ্বীপটা। খাওয়া-দাওয়ার পর মধ্যাহ্ন আর অপরাহ্ণ ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আদিবাসীদের নৌকা চড়ে কতদিন ফিরে এসেছি দ্বীপটি থেকে। যেদিকে

তাকাই—সমুদ্র। উধাও সমুদ্রের বুকে কূর্মপৃষ্ঠের মত ভেসে আছে রস্‌দ্বীপ। বাতিঘরের বাঙালী কর্মচারীটির সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ঘুরতে বেরুতাম এদিক ওদিক। এক কিনারে, বাতিঘরের একেবারে বিপরীত দিকে দু-একটা কুঁড়েঘর ছিল আদিবাসী অঙ্গিদের। ওরা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ত, কখনও বা যেত পোর্ট ব্লেয়ারের হাটে-বাজারে, কখনও দেখতাম ওদের নৌকাটির পাশে আরও নৌকো এসে ভিড়েছে।

ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলের দিকে বসতাম গিয়ে বাতিঘরে। ছোট্ট কেবিন—অফিসও বটে, ঘরও বটে। ভদ্রলোক বিকেলের দিকেই আসতেন ডিউটি দিতে। তিনি একে বাঙালী, তার ওপরে আমার স্বজাতি, হৃদ্যতা হয়েছিল সহজেই। কিন্তু যে অদ্ভুত রাত্রিটির কথা আজ আমার মনে পড়ছে তার আগে পর্যন্ত, সত্যিকার পরিচয় আমি পাই নি তার। খাকী রঙের প্যাণ্ট আর শার্ট পরা সেই তো দোহারা চেহারার কালো লোকটি, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে, কথা অবশ্য বলতেন কম, সাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম, স্মিত হাস্যে ভরে যেত তাঁর মুখ, বলতেন, বসুন।

ছোট টেবিলের এক পাশে কিছু ফাইল কাগজপত্র, কার্বন পেপার আর পেনসিল, অন্য পাশে সিগন্যালিংয়ের যন্ত্রটা—বড় ক্যামেরার মত দেখতে, কেবিনের জানলা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে লেন্স-বসানো নল, সেইখান দিয়ে সমুদ্রে জোরালো আলো ফেলে অপেক্ষমান অথবা চলমান জাহাজের আলোক-প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আলোকরশ্মি ফেলে আর নিবিয়ে নির্বাক প্রশ্ন-বিনিময়। হয়তো গিয়ে বসেছি, ভদ্রলোক দু-একটা কথা বলার পরই তাঁর যন্ত্রটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ আলো জ্বালা আর নিবানো চলল। যন্ত্র ছেড়ে চেয়ারে ভাল করে বসতেই জিজ্ঞাসা করতাম, কে?

বলতেন, মাদ্রাজ থেকে এসেছে। "মারিয়া-এল্"। ভাড়া করা গ্রীক জাহাজ। মালবাহী। বলছে—পোর্টে ভিড়ব। পাইলট চাই। এজেন্ট—আকুজী।

বলেই ফোনটা তুলে নিতেন, হ্যালো!

পোর্ট-অফিস আর এজেন্ট-অফিসে দিতেন সংবাদ। কিছুক্ষণের ব্যস্ততা, আবার সব চুপচাপ। ফাইলের কাগজে কী সব লিখতেন, প্যাডের কাগজের নীচে কার্বন বসিয়ে পেনসিলে লিখতেন বোধ হয় জাহাজের নাম আর পরিচয়, তারপরে হাফ-প্যাণ্ট-পরা ঘোর কালো বর্ণের আদিজাতীয় আদিবাসী বেয়ারাটার হাতে চিঠি দিয়ে তাকে পাঠাতেন এবার্ডিনের পোর্ট-অফিসে।

বলতাম, আচ্ছা, আপনি সব সময়ে এই দ্বীপে থাকেন, এবার্ডিনে যান না কখনও?

একটু হেসে বলতেন, যাই বইকি। মাইনের দিনে। আর কখনও-সখনও অফিসে ডেকে পাঠালে।

বলতাম, না না, তা বলছি না। কত বাঙালী রয়েছেন এবার্ডিনে, বিঘীলাইনে সরকারী প্রেসের ওপরেই তো রয়েছে বাঙালীদের ক্লাব, কখনও তো আপনাকে দেখি না ওখানে!

না। আমি কোথাও যাই না। বেশ আছি দ্বীপে।

একা একা ভাল লাগে আপনার?

একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন একা! একা কোথায়! আমি আর আমার স্ত্রী থাকি, আর আছে ওই বেয়ারাটা।

এবার অবাক হবার পালা আমার, বললাম, আপনার স্ত্রী! কখনও তো দেখি নি তাঁকে! এই তো এতদিন এলাম, কখনও তো বলেন নি তাঁর কথা, কখনও তো আলাপ করিয়ে দেন নি তাঁর সঙ্গে!

বললেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা কঠিন নয়। আমার কোয়ার্টারে গেলেই সেটা হতে পারে। অবশ্য আমিই আপনাকে কোনদিন নিয়ে যাই নি আমার কোয়ার্টারে। ইচ্ছা করেই নিয়ে যাই নি। আপনার ভাল লাগত না। কারুরই লাগে না। কেউই আসে না আমার বাড়ি।

কেন?

বললেন, সে অনেক কথা। এবার্ডিনের যে-কোনো লোক জানে, এবং বোধ হয় আমার থেকেও বেশী জানে।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

একটু ম্লান হেসে বললেন, রটনা-ব্যাপারটাই এমন যে যাকে নিয়ে রটনা, তার থেকে লোকে ঘটনাটা অনেক বেশী জেনে ফেলে। আমাকে নিয়েও অমনি রটনা আছে, আপনি তা এখনও শোনেন নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি আসেন-যান, আমি ভাবতাম, রটনা শোনার পরেই আপনার কৌতূহল জন্মেছে আমার সম্বন্ধে। চিড়িয়াখানার জন্তু দেখবার মতই বাতিঘরের এই অদ্ভুত লোকটাকে আপনি এসে দেখে যান মাঝে মাঝে।

—ছি-ছি! অমন কথা বলবেন না। আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এবার কৌতূহল হচ্ছে। আপনার স্ত্রী…

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আমার স্ত্রী আদৌ অসূর্যম্পশ্যা নন, তাঁকে এবার্ডিনে হয়তো আপনি দেখেছেনও। প্রায়ই তাকে যেতে হয়। হাট-বাজার তো সে-ই করে। আজও সে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনও এল না তো!

বলেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ডেকে বললেন, মিস্টার ব্যানার্জি!

—আজ্ঞে?

মুখ ফিরিয়ে বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আপনি এইবার আদিবাসীদের ডোঙায় করে ফিরবেন তো? পারবেন না। এখন ডোঙা খুলবে না ওরা।

—কেন?

—'টারাই' উঠেছে।

—মানে!

—ঝড়ের অপদেবতা হচ্ছে দুজন। বিলিকু আর টারাই। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ঝড় হচ্ছে বিলিকু, আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঝড় হচ্ছে টারাই। দেখুন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—ঢেউগুলি যেন খ্যাপার মত কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অফিসের নির্দেশে রেড সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছি। রীতিমত সাইক্লোন হবে মনে হচ্ছে। আপনার আজ আর ফিরে যাওয়া হল না।

বললাম, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার স্ত্রীর কথা ভাবছি।

বলে উঠলেন, বেয়ারাটা সঙ্গে আছে আজ। কিন্তু তার নিষেধ তো সে শুনবে না।

নিজেই ডোঙা চালিয়ে চলে আসবে।

—বলেন কী, এই ঝড়ের মধ্যে!

—সেই তো ভয় মিস্টার ব্যানার্জি, যদিও সামান্য পথ, কিন্তু তবুও তো সমুদ্র, যদি ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যায় গভীর সমুদ্রে! যদি উলটে যায়! যে কাঠ দিয়ে ওদের ডিঙি তৈরী, তা অবশ্য ডুববে না, কিন্তু····! ও-যে টারাই-ফারাই কিছু মানবে না! দাঁড়ান, দেখি। এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি, বলুন তো?

খুঁজে-ফেরা-আলোর আবর্তনের দিকে ওঁর সঙ্গে আমিও তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ব্যাদিত দন্তপংক্তির মত মনে হতে লাগল ভেঙে-পড়া উত্তাল ঢেউয়ের সাদা-সাদা ফেনাগুলিকে!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর উনি এসে বসে পড়লেন চেয়ারে, দু হাতে মুখ লুকিয়ে। না, খুঁজে খুঁজে কোনও নৌকোই দেখা যায় নি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবিনের ইলেকট্রিক বালবটা দিয়ে কেমন যেন লালচে একটা আলো আসছে। আর বাইরে, বাতি-ঘরের পায়ের কাছে পাথরের স্তূপের ওপর মহাসমারোহে এসে ভেঙে পড়ছে ঢেউ!

জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটেছে, কত দেশই তো দেখলুম, কত লোকের সঙ্গেই না হল পরিচয়! কলকাতার বাসায় বসে আজকের রাত্রিটিকে অনুভব করতে করতে আন্দামানের সেই ঝড়ের রাত্রিটির কথাই মনে পড়ে গেল। বাতিঘরের সেই বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম আমি প্রকাশ করতে পারব না, এ গল্পের জন্য তার নাম বরং দেওয়া যাক—সুমিত মুখার্জি। 'মুখার্জি' তিনি সত্যিই, কিন্তু 'সুমিত' তিনি নন, আমি তাকে 'সুমিত' করে নিলাম।

মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে যিনি গল্প খুঁজে বেড়ান, জীবন-লীলার মধ্যে সেই লেখক হচ্ছেন তৃতীয় ব্যক্তি। যাঁদের নিয়ে গল্প

লিখব, সেই নায়ক-নায়িকার জীবনে লেখক তো তৃতীয় ব্যক্তিই। নিজেকে কাহিনীর সঙ্গে না জড়িয়ে কাহিনীকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যেই গল্প-লেখকের সার্থকতা, মনীষীরা বলে থাকেন। লেখক করবেন 'নায়ক' সৃষ্টি, নিজে 'নায়ক' হবেন না—এ কথাও কেউ কেউ বলেন। কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে আমি নিজে এক চমকপ্রদ ঘটনার 'নায়ক' হয়ে বসেছি। এক অত্যাশ্চর্য চরিত্রের নায়িকা আজ আমার চারিদিকে রচনা করে চলেছে এক অপরূপ বঞ্চনার উর্ণনাভ,—আমি সম্মোহিতের মত বসে বসে শুধু তাই প্রত্যক্ষ করে চলেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি, একে ছিন্ন করা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন আসবে আমার জীবনে অন্য এক নারী তার সত্যিকার ভালবাসা আর স্নেহ নিয়ে! কিন্তু সে কি সম্ভব? অস্থির চিত্তে বিনিদ্ররাত অতিবাহিত করতে করতে এই প্রশ্নই নিজেকে করেছি, সে কি সম্ভব? কখনও কারুর জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? এই অন্বেষণের ঘটনা?

নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই সেই ঝড়ের রাত্রিটার কথা মনে পড়ল, সেই ঝড়ের দেবতা 'টারাই'-য়ের অতর্কিত আবির্ভাবের কথা। বাতিঘরে সেই খুঁজে-ফেরা আলোর কথা, মুখার্জির সেই দুহাতে মুখ লুকিয়ে অবসন্নের মত চেয়ারে বসে পড়ার কথা। নিজের কাহিনী লিখতে গিয়ে কেন যে সুমিতের কাহিনী লিখতে বসলাম, তার কারণ বিশ্লেষণ করবেন মনস্তাত্বিক। আমার মনে হয়, আমার জীবনের এই সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে আমি সুমিতের জীবনের ঘটনারই অনুরণন শুনতে পেয়েছি। সুমিতের জীবন-কাহিনীর মধ্যে যে বেদনার সুর আছে, তার সঙ্গে কোথায় আছে আমারও জীবন-বেদনার কোন্ গভীরতম মিল, নইলে অন্তত আমার আজকের মানসিকতার মধ্যে তার কথা এমন করে হঠাৎ মনে পড়ত না।

সুমিত এক সময় মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, উঠে দাঁড়াল, সরে গেল জানলার কাছে, দেখল সমুদ্রে ঝড়ের সেই মত্ততা, আবার ফিরে এল চেয়ারে, আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, তখন ব্রিটিশ আমল। নূতন এসেছি এখানে চাকরি নিয়ে। রস্‌দ্বীপ তখন সাহেবদের

পল্লী। ইউরোপীয়দের সঙ্গে দু-একজন বাঙালী সাহেবও আছেন। কিন্তু বাঙালী হলেও তাঁরা সাহেব, আমার সঙ্গে কোনও সংযোগই নেই তাঁদের। তাঁদের আছে ক্লাব, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল ইত্যাদি। সব এই রস্‌দ্বীপে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখি, আর সময় পেলেই এবার্ডিনে যাই। প্রথম প্রথম সবই ভাল লাগত, কিন্তু যা হয়, ক্রমে ক্রমে সব-কিছু একঘেয়ে হয়ে গেল। তখন এই বাতিঘরের পাশেই কাঠের চালা ছিল, তার একটিতে থাকতাম। শুয়ে-বসে বই পড়ে কাটানো আর ডিউটিতে এসে আলো ফেলা—এই ভাবে দিন কাটছে।

কিন্তু আস্তে আস্তে মন বসতে লাগল জায়গাটায়। এবার্ডিনে গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাউণ্ট হ্যারিয়টে ওঠা বা হৈ-চৈ করার থেকে এই দ্বীপে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যেন অনেক ভাল মনে হত। বসে বসে সমুদ্রের রঙ দেখতাম। দেখতে দেখতে মনে হত, সারাটা ছুটির দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, এইভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ অনায়াসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। দিগন্তে শ্রেণীবদ্ধ মেঘ উড়ে যায়, উড়তে উড়তে ওরা যে কত আকার ধারণ করে! কখনও মনে হত বিরাট এক রাজপুরী দেখতে পাচ্ছি, কখনও মনে হত অতিকায় এক রথকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছে সপ্ত-অশ্ব। আর তারই নীচে কখনও কখনও ছোট ছোট ঢেউয়ে উদ্বেল হয়েছে সমুদ্র, কখনও বা ভাঙা ঢেউ নেই, নিস্তরঙ্গ নিথর মনে হচ্ছে সমুদ্রকে।

এক মর্নিং ডিউটিতে গিয়ে মেয়েটিকে আমি প্রথম দেখি। কেবিনে ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছি, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, সমুদ্রের ঢেউ এসে যেখানে পড়ছে, সেই প্রস্তরস্তূপের উপরে বসে আছে সাদা-শাড়িপরা তরুণী একটি মেয়ে, শাড়ি পরার ধরন দেখে বাঙালীই মনে হয়। চুপচাপ বসে আছে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, ঝিরঝিরে ভোরের বাতাসে উড়ছে ওর খোলা চুল।

কিন্তু যেভাবে বসেছে, যদি ঢেউয়ের ধাক্কায় পাথর আলগা হয়ে

পড়ে যায়? কেবিন থেকে বেরিয়ে ঘুরে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, শুনছেন?

একটু চমকেই আমার দিকে মুখ ফিরাল। বললাম, ওভাবে ওখানে বসে থাকবেন না, পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। হয়ত বা একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপরে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল কোয়ার্টারগুলোর দিকে। যেটুকু দেখেছিলাম, তাতে এটুকু সেদিনই বুঝেছিলাম, মেয়েটি বাঙালী এবং বিবাহিতা, সিঁদুর ছিল তার সিঁথিতে।

পরের দিনও সকালে গিয়ে দেখি, মেয়েটি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছে। তবে পাথরের ওপর গিয়ে বসে নি,—প্রস্তরস্তূপের পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি খোলা ওর চুল, তেমনি ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। মেয়েটি হঠাৎ মুখ ফেরাল। মৃদু হাসির একটা রেখা যেন ফুটে উঠল ওর মুখে। আমি চট করে মুখ নামিয়ে কেবিনের ভিতরে চলে গেলাম।

পরের দিন মেয়েটি কিন্তু কথা বলল। আমাকে কেবিনের দিকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শুনুন।

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই কয়েক পা এগিয়ে এল, বললে, আপনার বাতিঘরটা একটু দেখতে দেবেন?

একটু ইতস্তত করে অবশেষে বললাম, বেশ তো, আসুন না।

ঘুরে ঘুরে সব দেখল। নীচের সিগন্যালিং মেশিন থেকে শুরু করে ওপরের বড় আলো, রিফ্লেক্টর, সবই দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখবার পর আমার কেবিনে নেমে এসে বললে, আপনিই তো মিঃ মুখার্জি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম মুখার্জিই বটে। আপনি কেমন করে জানলেন?

একটু হেসে বললে, আমার স্বামী বলেছেন। এই দ্বীপে বাঙালী মাত্র তো আমরা তিনজন, আমার স্বামী, আমি আর আপনি।

বললাম, তা হবে। কিন্তু আপনার স্বামী আমাকে চেনেন?

আবার একটু হাসল, বললে, তা চেনেন বইকি। একা একা ঘুরে বেড়ান, কোথাও যান না,—কেমন এক ধরনের চুপচাপ লোক। মিস্টার সিনা, অর্থাৎ আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ওই ভদ্রলোক, জান? আপনি তখন আমাদের কোয়ার্টারের রাস্তা দিয়ে অঙ্গিদের পাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন, জানলা দিয়ে আপনার দিকে একবার তাকাল মিঃ সিনা, বললে—ও তো বাঙালী, আমাদের বাতিঘরের ছোকরা।

বললাম, তাই বলুন, আপনি মিসেস্ সিনা, আমাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার সিনার স্ত্রী। তা বাতিঘর দেখতে আপনার আবার অনুমতি কী? মিস্টার সিনার হুকুম পাওয়া মাত্রই····

বাধা দিয়ে বললে, থাক্। উনি আছেন ওঁর মত, আমি আছি আমার মত। আচ্ছা, আজ চলি। বলেই আর দাঁড়াল না, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

পরের দিন যথারীতি গিয়ে চেয়ারে বসেছি, পিছন থেকে শুনতে পেলাম মৃদু কণ্ঠস্বর—আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে, আসুন।

এসে, আমার অনুরোধ মত বসল সামনের চেয়ারে, বললে, রোজ সকালে বেড়াতে আসি তো, বেড়িয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করে গেলে কেমন হয়?

বেশ তো।

মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, বললে, আচ্ছা, এই যে দ্বীপে পড়ে আছেন, দেশের জন্য মন কেমন করে না?

বলে ফেললাম, আপনার করে না?

এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে উঠল, করে না আবার! আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।

বললাম, সে কী! এখানে অফিসারদের জন্য কত রকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা···

ছাই ব্যবস্থা। ওসব ক্লাব-টাব নাচ-টাচ মোটেই ভাল লাগে না।

অদ্ভুত একটা বেদনার ছায়া দেখতে পেলাম আয়ত চক্ষুর তটরেখায়।

বললাম, খুব ভোরে তো ওঠেন দেখছি।

হ্যাঁ। সূর্যোদয় দেখি। ওই আমার রিক্রিয়েশন। কিন্তু আপনাকে যে প্রশ্ন করলাম, তার উত্তর কই ?

বললাম, মন কেমন করবার মত মানুষ দেশে আমার কেউ নেই। মা-বাপ মারা গেছে বহুদিন, দাদারা পর হয়ে গেছে, বলতে পারেন।

চোখের ঘন কালো তারা দুটি যেন ঈষৎ কৌতুকে ঝলমল করে উঠল, বললে, তবু ?

হেসে ফেললাম ঃ না। আমি একা। আর সত্যি কথা যদি শুনতে চান তো বলতে পারি, জায়গাটায় আমার মন বসে গেছে। সমুদ্র দেখে দেখে দিন বেশ কেটে যায়।

কেমন-যেন বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বললে, আচ্ছা, সেদিন দুপুরে দেখেছিলাম, আপনি ওই অঙ্গিদের নৌকোয় করে সমুদ্র বেড়াতে গেলেন, ভয় করল না ?

এবার অবাক হলাম আমি, বললাম, ঃ বা রে, আমি কী করি আর না করি, আপনি লক্ষ্য করেন নাকি ?

একটু যেন আরক্তিম হয়ে উঠল মুখখানা, মুখ নীচু করে টেবলের ওপরে হাতের আঙুলগুলি আপন মনে বুলতে লাগল কিছুক্ষণ। বললাম, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কথা তো জানি। ভীষণ কাজের লোক। আপনার সময়ই বা কাটে কী করে ? কাঁহাতক প্রতিবেশী মেমদের সঙ্গে ইংরেজী বলে সময় কাটানো যায়, তাই নিজের ভাষায় আলাপ করার জন্য সঙ্গী খোঁজেন, না ?

তা সঙ্গীটি বেছেছেন ভাল, একেবারে কাঠখোট্টা লোক।

অদ্ভুত কৌতুকে ঝিলমিল করছে দুটি চোখ, বললে, মোটেই না। দিব্যি কথা কইতে জানেন দেখছি। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে।

হেসে বললাম, তিরস্কার করবেন না। দ্বীপের লোক, মিশি অঙ্গিদের সঙ্গে, সভ্যতা-ভব্যতা অত বুঝি না। কী বলতে কী বলে ফেলি।

উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, বললে, কন্‌ফেশনে খুশী হলাম, কিন্তু আরও খুশী বিকেলে ার বাংলোয় এসে চা খেলে।

ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হাত জোড় করে বললাম, ওইটি পারব না। বরং আপনি যদি আমার চালায় এসে…

আবার কৌতুকে ঝলমল করে উঠল দুটি চোখ, বললে, সত্যিই সমাজ-ছাড়া লোক আপনি; তা কী হয় নাকি? তা ছাড়া, আপনার সেই অঙ্গি ঝি-টি তো আমাকে দেখলে দুই চোখ দিয়ে গিলেই ফেলবে।

একটু অবাক হয়েই বললাম, সত্যি, আমার একটি অঙ্গি ঝি আছে, রান্নাবান্না আর ঘরের কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। কিন্তু আপনি জানতে পারলেন কী করে?

বললে, কাল দুপুরে আপনার বাসা দেখতে আসছিলাম। দেখি বারান্দায় মেয়েটি বসে কী কাজ করছে। পরনে অঙ্গিদের মত বাকল, তবে আর সব অঙ্গি মেয়েদের মত নয়, বুকে কাপড় আছে, আর চুলও ছোট করে ছাঁটা নয়, বড় চুল,—মাথা ছাপিয়ে কাঁধ পর্যন্ত এসেছে।

বললাম, আমার আগে ও-কোয়ার্টারে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে ছিল, মেয়েটি তার বাসায় কাজ করত, দুটো-একটা ইংরেজী কথাও জানে।

বাধা দিয়ে বলে উঠল, বাংলাও জানে। আমাকে দেখে কটমট করে তাকাল, বললে, কেন?

হাসবেন না, 'কে'-কে 'কেন' বলেছে, কিন্তু বলেছে তো! কী নাম ওই মেয়েটির?

বললাম, সারা। দু-তিন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। কিন্তু আপনি কাল এসেছিলেন? কী সৌভাগ্য! আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাই বুঝিয়েছিল বটে। কী আর করব, ফিরে এলাম!

দয়া করে আজ আসুন না।

—না।

বলেই আর দাঁড়াল না, সোজা চলে গেল। নিজের বাড়ির দিকে।

বেশ ছিলাম, একা-একা, আমি, সমুদ্র আর এই বাতিঘর। কিন্তু হঠাৎ কে যেন এসে আমার সমস্ত ভিত্তিমূল ধরে প্রবল নাড়া দিল। যেন হঠাৎ একটা উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া এসে আমার সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। মর্নিং ডিউটি থাকলে ও আসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিকেলের ডিউটিতে আসে সূর্যাস্তের গোধূলি-ক্ষণে। কিন্তু মাত্র এই বাতিঘর, কখনও আসে না আমার বাসায়। বলতাম, আমার বাসায় আস না কেন? গল্প করার কত সুবিধে!

রহস্যময় অদ্ভুত এক ধরনে হাসত ঠোঁট টিপে, বলত, ভয় করে।

কেন?

বলত, তুমি আমার বাংলোয় আস না কেন?

বলতাম, আমি যাই না মিস্টার সিনা কী ভাববেন বলে।

হঠাৎ বলে উঠত, মিস্টার সিনা সম্বন্ধে কতটুকু জান তুমি?

কতটুকু! কিছুই না।

তবে!—তিরস্কারের সুরে বলত, চুপ করে থাক।

বলেই আবার হেসে ফেলত, বলত, এই, জান?

কী?

সেদিন যে চিঠিটা দিয়েছিলে, সেটা ওর হাতে পড়ে গেছে।

চমকে উঠে বললাম, তারপর?

পড়ে বললে, গুড। লভ্-লেটার-লেখায় ছোকরার হাত আছে।

বললাম, বাস্।

হ্যাঁ, বাস্। এসব ব্যাপারে ওর কোন চেতনাই নেই। অফিসের পর ওর ক্লাব আর ড্রিঙ্ক,—বাড়ি এসেও তার জের। এই তো ওর জীবন।

একটু থেমে তারপরে বললাম, ব্যাপারটা ভাল হল না। চিঠি লেখালেখি শুরু করলে তুমিই প্রথম।

বেশ করেছি।

বললাম, আচ্ছা মিস্টার সিনা খুব ড্রিঙ্ক করেন, না ?

তুমি আপত্তি কর না ?

না।

কেন ?

অদ্ভুতভাবে হাসল, বললে, করে লাভ নেই।

তারপরেই আমার হাতে নিজের হাতটি সঁপে দিয়ে বলে উঠল, তুমি কোনদিন মদ খেয়েছ ?

বললাম, না, ওসব আমার ঘৃণার বস্তু।

তা তো দেখতেই পাই। সিগারেটটিও খাও না, লক্ষ্মী ছেলে।

শুধু বাতিঘর নয়, সকালে কিংবা বিকেলে সময় ও সুযোগ বুঝে আমরা সমুদ্রের ধারটিতে গিয়ে বসতাম, প্রস্তরস্তূপের আড়ালে অথবা নারকেলবীথির ছায়ায়। কখনও-সখনও আমার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকত। কখনও বা আমার কোলে। একদিন বললে, এই, তোমার একটা নামকরণ করেছি। ছোট্ট নাম।

একটু হেসে বললাম, কী, শুনি ?

বললে, মিতা।

বেশ।

বললে, মিতা, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার সেই অঙ্গি ঝি-টি আমার বাসায় এসেছিল।

সে কী! কেন ?

কে জানে! হয়তো কাজ খুঁজছে। আমার বেয়ারার মুখে শুনলাম। সে ওকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, বেশ করেছে। মেয়েটাকে আমিও তাড়াব।

হেসে বললে, ওমা, কেন ?

বললাম, শুনবে ? সেদিন দেখি, আমার সাবানটা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে চান করছে। খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, বেশ করেছে !

কিছুদিন পরে এমন হল, ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে, ওকে না দেখতে পেলে থাকতে পারতাম না, হাঁপিয়ে উঠতাম। নারিকেল-বীথির ছায়ায় আমার কোলে মাথা রেখে সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যা নামছে দেখতে দেখতে একদিন বললে, তোমার সেই নামটা আরও ছোট করে নিয়েছি।

কী?

বললে, মিতু।

বললাম, বেশ তো ছিলাম একা-একা, এমন পাগল করে দিলে কেন?

ঠোঁট টিপে একটু হাসল, বললে, করেছি নাকি?

ওর হাসি-হাসি-ভরা মুখখানার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতাম। একসময় বলত, এমন করে তুমি কী দেখ, বল তো!

কী দেখি কে জানে! অদ্ভুত ভাল লাগে। সুন্দর লাগে!

খিল খিল করে হেসে উঠত, বলত, সুন্দর, না ছাই!

বলতাম, নিজের মুখ কখনও আয়নায় দেখেছ?

মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠত। ধীরে ধীরে উঠে বসত, কোন-কোনদিন ওর চোখে দেখতাম জল, তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম, এ কী! কাঁদছ তুমি?

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে বলত, না।

তারপর উঠে দাঁড়াত, বলত, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এবার ফিরতে হবে।

জিজ্ঞাসা করতাম, একটা কথা বলবে?

কী?

—সন্ধ্যার পর কোনওদিন আমার কাছে থাকতে চাও না, কেন বল তো?

কেমন যেন উত্তেজিত মনে হল ওর কণ্ঠস্বর, বললে—থাকবার উপায় নেই। ক্লাব থেকে আসবে যে মিস্টার সিনা। এসে না দেখলে আর রক্ষে নেই।

একটু থেমে তারপর বলতাম, অদ্ভুত, তাই না?

বাঁকা হেসে বলত, কিন্তু তবুও কিছু জান না। তুমি যতটা অদ্ভুত ভাব, তার থেকেও অদ্ভুত ও।

আমাকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাকাতে দেখে বলে উঠল, চিঠি লিখি আর যাই করি সারাদিন ধরে, কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু রাত্রে কাছে থাকা চাই।

একটু হেসে বলতাম, খুব ভালবাসে, না?

কী বললে?—যেন চোখ দুটো জ্বলে উঠল মুহূর্তে, বললে, ভালবাসা! আমাকে এত ও ঘেন্না করে যে তুমি জান না।

ঘৃণা!

হ্যাঁ, আমিও ঘেন্না করি। ওকে কিছুতেই সইতে পারি না।

অবাক হয়ে বলতাম,—সুখী নও?

চোখ ভরে উঠত জলে, মুহূর্তে আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদত। কান্নার আবেগ একটু কমলে ডাকতাম ওর নাম ধরে, বলতাম লতা!

মুখ তুলে বলত, কী?

আমাকেই শেষ পর্যন্ত ভালবাসলে? কী আছে আমার?

কে জানে! আমি তোমাকে পাগল করি নি, তুমি আমাকে পাগল করেছ গো। বলেই হঠাৎ দুই বাহুলতা আমার গলায় জড়িয়ে আমার বুকে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকত। আর আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি ওকে পাগলের মত চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলতাম। সে বেপথুমানা চুম্বিতা দেহলতার মাধুর্য বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। যেন মনে হত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে শুকিয়ে অবশেষে তরুলতা পেয়েছে স্নেহসিঞ্চিত বর্ষার ঝরঝর বারিধারার অন্তরঙ্গ আশ্লেষ। আমার আদর ও যে প্রাণ ভরে উপভোগ করত সন্দেহ নেই, কিন্তু পর-মূহূর্তেই কী যে হত, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে ছুটে চলে যেত বাংলোর দিকে।

তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। চুপচাপ সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে ঢেউ-ভাঙার আর্তনাদ শুনলাম, তারপর ধীর পায়ে চলে এলাম বাসায়। সাজানো কাঠের গুঁড়ির উপরে তৈরী কাঠের ঘর, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই চোখ পড়ল, বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা। ওদের ভাষা কিছু কিছু বলতে পারতাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কী করছিস? বাড়ি যাস নি যে?

উত্তর দিল বাংলায়, বললে, না।

এই মেয়েটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। সকালে অথবা দুপুরে ঘরের কাজ যখন ও করতে আসত, কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের ভাষায় এটাকে কী বলে, ওটাকে কী বলে? এই ভাবে দুটো একটা করে বাংলা শব্দ শিখে রাখত। মনে রাখবার ক্ষমতা দেখতাম ওর অসাধারণ। একবার যা শিখত, তা ভুলত না।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রান্না হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কী কী রান্না করলি?

—ভাত, ডাল, মাছ।

আমি বসে বসে ওকে আমাদের রান্না শিখিয়েছিলাম, এখনও ভাল রপ্ত করতে পারে নি, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করত সব কিছু শিখে নিতে। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম, ও রান্না নিজে কখনও খেত না, দিলেও না। মাছ দিলে, কাঁচা অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যেত।

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললাম, বাড়ি যা এবার। কিন্তু গেল না, বারান্দায় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে গিয়ে খাবার-টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে এসেছি, তখনও দেখছি যায় নি, ঠায় সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কী, কাঁদছিস কেন?

কোন উত্তর নেই। কেমন একটা মায়া হল। ওর বরের নাম ছিল টেবু। বললাম, কী রে, টেবু বকেছে?

মুখ তুলে তাকাল, বললে, টেবুর সঙ্গে বিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে অনেকদিন।

সে কী! কেন, কেন রে?

কোন উত্তর দিলে না, ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

একটু বিব্রত বোধ করেই বললাম, কী হয়েছে রে?

কিছু না।

কী মুশকিল! এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদবি নাকি, আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব না?

একবার মুখ তুলে তাকাল, বললে, যা—তুই শুতে। আমি এখানে একটু বসে থাকব।

ধমকে উঠলাম রীতিমত, বললাল, না। বাড়ি যা শীগ্‌গির!

দুটি সরল আর অবুঝ আঁখিতারায় লাগল বিস্ময়ের ঘোর, বলে উঠল ঃ তুইও টেবুর মত বকবি বাবু!

কেন জানি না, হঠাৎ একটা দুঃসহ ক্রোধে জ্বলে উঠলাম মুহূর্তে, বললাম, কী চাস তুই এখানে? ভাবছিস আমি কিছু বুঝি না, না! বদমাইশ মেয়েমানুষ কোথাকার বেরিয়ে যা তুই এখুনি।

সেলুলার জেলে অপরাধীকে হাত পা বেঁধে চাবুক মারার সময় প্রথম চাবুকের তীব্র আঘাতে মানুষের মুখে যে দুঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছি,—মনে হল সারার মুখেও ফুটে উঠেছে সেই প্রচণ্ড ব্যথা। কিছুক্ষণ পাথরের মত নিস্পন্দ থাকার পর বললে, যাচ্ছি, বাবু।

ধীর-পায়ে দেহটাকে টেনে পাহাড়ের বন্ধুর পথ বেয়ে চলে গেল সারা।

কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা আর চেতনা জুড়ে বিরাজ করছে অন্য মেয়ে। পরদিন আবার নিভৃত সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে বললাম ওকে সারার সব কথা। শুনে একটু যেন অবাক হল, বললে, সে কী গো, সত্যি তুমি অমন কড়া কথা বলতে পারলে।

একটু হেসে বললাম, পারলামই তো।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার মুখে হাত বুলতে বুলতে বলে উঠল, না, আমার মিতুকে আমি চিনি। অতি ভাল মানুষ সে, অতি শান্ত, অতি মধুর। তুমি যে কঠোর হতে পার, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি নিজে তো কম অবাক হই নি! হঠাৎ এ-রকম ক্ষেপে গেলাম কেন! কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল, তারপরে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বুঝেছি।

কী?

বললে, একদিক থেকে তোমরা পুরুষরা সবাই এক।

কী রকম!

মুখ টিপে একটু হেসে বললে, যখন কাছে পেতে ইচ্ছা করে, তখন যদি না পাও, তখনি ক্ষেপে যাও তোমরা। আমাকে না-পাওয়ার রুদ্ধ বেদনা যে ও-ভাবে ও-বেচারীর ওপরে প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়বে, এটা তুমি নিজেও বোধ হয় ভাবতে পার নি।

মনে মনে চমকে উঠলাম ওর বিশ্লেষণীশক্তি লক্ষ্য করে, বললাম, কথাটা মিথ্যে বল নি। কিন্তু এতই যখন বোঝ, তখন আমাকে ক্ষেপিয়ে দাও কেন? কেন আজও ধরা দিলে না?

একটু হেসে দু হাতে আমার কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে বললে, এই তো আমি। আর কী চাও?

মুহূর্তে আদরে আদরে ওকে ভরিয়ে দিয়ে বললাম, পুরুষের প্রেম কি এখানেই সীমারেখা টানতে চায়? তুমিই বল?

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, কিন্তু উপায় যে নেই মিতু।

কেন?

অদ্ভুত উত্তেজিত মনে হল ওকে, বললে, না না, সে আমি তোমাকে বলতে পারব না? শুনতে চেও না তুমি।

বলেই নিজেকে সামলে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সে, স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল মুখ, আমার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বললে, এই-ই বেশ, নয় কী?

পরের দিন বিকেলে হাসতে হাসতে বললে, এই, জান? একটা মজা হয়েছে।

কী?

—তোমার সেই সারা আমার কাছে গিয়েছিল।

—সারা!

—হ্যাঁ।

সারার কথাটা উঠতেই মনে হল, এই দু দিন তাকে আমি দেখিই নি। কখন চুপিসারে চোরের মত এসে নিজের কাজ করে গেছে। বিকেলে বেরিয়ে আসি, এই সুযোগে ও ওর কাজ করে চলে যায়। আমার ঘরের চাবি দুটো—একটা আমার কাছে, আর-একটা ওর কাছে থাকত। বহুদিন থেকেই চলে আসছিল এ-ব্যবস্থা। সেদিক থেকে সারাকে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না। বললাম, তারপর?

বলল, অবাক কাণ্ড! আমার কাছ থেকে পুরনো শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ এক প্রস্থ চেয়ে নিয়ে গেল।

—সে কী!

হেসে বলল, হ্যাঁ গো। কী করে পরতে হয়, তাও শিখে নিয়ে গেছে!

—বল কী! তুমি দিলে ওকে কাপড়চোপড়?

হেসে বললে, দিলাম। তোমারই তো ঝি, মায়া হয় না?

পরদিন আপিসের পর বাড়িতে বেশীক্ষণ রইলাম সারাকে ধরার জন্যে। দেখি ওর কথাই ঠিক। শাড়ি পরে বাঙালী মেয়ে সেজে ধীর পায়ে বাড়ি ঢুকে চুপি চুপি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, ধারালো গলায় ডেকে বললাম, এই, শোন্।

একটু চমকে ভীরু দুটি চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকাল, তারপরে আস্তে আস্তে কাছে এল। ওর এই বিনম্র বিনীত ভঙ্গী আমাকে আরও খেপিয়ে তুলল, ধমকে বলে উঠলাম, এ সব কী? পরের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? তোর শাড়ি পরার শখ তো আমাকে বললি না কেন?

আবার মুখ তুলে তাকাল, সে যে কী বেদনার অব্যক্ত বাণী ফুটে উঠেছিল, তা বলে বোঝানোর নয়। মুখ নীচু করে বললাম, আচ্ছা যা, তোর কাজ কর্ গিয়ে, যা।

ভিতরে গেল, আমিও চলে এলাম বাইরে। সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে ছিল সে। আবার সেই সন্ধ্যা হয়ে আসা। আবার সেই ঘন হয়ে বসে কথার মালা গাঁথা, আবার সেই আদরে পাগল করে দিয়ে রহস্যময়ীর অবশেষে ছুটে চলে যাওয়া।

বাড়ি ফিরছিলাম, আর বুকের ভিতরটা তীব্র বেদনায় টনটন করে উঠছিল। ভাবলাম, এ ফাঁকির খেলা আর না, এর শেষ করতেই হবে। ও যদি ধরা না-ই দেবে তো এ উন্মাদনার সৃষ্টি করে কেন! তবে কি ওর ভালবাসার এ লালার সবটাই প্রবঞ্চনায় ভরা! ভাবতে ভাবতে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম, যেন মাতালের মত টলছি। কোনরকমে ঘরে ঢুকে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ওর কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে উঠল। হঠাৎ কপালে কার হাতের পরশ পেতেই চমকে মুখ তুললাম। দেখি, শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সারা। কিছু না বলে চোখ বুজলাম। আমার কপালে মাথায় ওর মৃদু করস্পর্শ যেন সান্ত্বনার বাণীর মতই গুঞ্জন করে ফিরছে, এক সময় শিয়রের কাছে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল, তারপর ওর হাত নেমে এল আমার মুখে গালে ঠোঁটে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে অবশেষে উঠে বসলাম, আর সেই দুটি ভীরু চোখের দিকে তাকিয়ে আবার গেলাম খেপে। কী যে হল আমার কে জানে, প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলাম গালে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। আমি তখন রাগে কাঁপছি ঃ বেরিয়ে যা। বদমাইশ মেয়েমানুষ কোথাকার!

কিন্তু আমার প্রেয়সীকে নিয়েও তো আমার শান্তি নেই। না-দেখে থাকতে পারি না। যাব না যাব না করেও পা চলে যায় সমুদ্রের ধারের সেই নারিকেলবীথির কুঞ্জের দিকে।

আবার সেই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি। দেহে-মনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে আবার ফিরে আসা, বিছানায় শুয়ে ছটফট করে সারাটা রাত কাটানো।

পরের দিন বললাম, মিস্টার সিনা আমাদের কথা জানেন। কিন্তু কিছু বলেন না কেন আমাকে? অন্য কেউ হলে তো—

বাধা দিয়ে হেসে উঠল, বলল, তোমাকে খুব ভালবাসেন। বলেন, দি রাইট ম্যান ইউ হ্যাভ গট। দেখো, তোমার না ইনক্রিমেণ্ট হয়ে যায়!

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, হেঁয়ালি রাখ। আমাকে সত্যি ঘটনাটা বলতে পার? এ অসহ্য যন্ত্রণা যে সইতে পারছি না আর।

দুটি চোখ তিরস্কারে নিবিড় হয়ে এল, বলল, অসহ্য যন্ত্রণা আবার কিসের! কই, মিস্টার সিনাও তো পুরুষমানুষ, তার মুখে তো শুনি না এ ধরনের কথা!

বললাম, শোনবার কথাও তো নয়।

—কেন?

—তুমি তো তাঁর, তবে আর তাঁর ভাবনা কী?

হেসে উঠল খিল খিল করে, বলল, আমি যে কার, সেটাই হচ্ছে কথা। শোন, আমি তো দেখতে ভাল নই, কালো। বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাকে তাঁর মনে ধরে নি। তিনি বিলেতফেরত মানুষ, সুন্দরী মেম দেখে দেখেই চোখ অভ্যস্ত। টাকার জন্য বিয়ে করেছেন, বাস্, এই পর্যন্ত। আমার সঙ্গে বয়সেরও অনেক তফাত। আমার কাছে যখন আসেন, মনে হয়, আমি এক অতিকায় রোমশ কোন বনমানুষের বাহুবন্ধনে যেন ধরা পড়েছি। আমার সারা দেহমন ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠত। কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই, বিয়ে যখন করেছি।

—একটা কথা বলব?

—কী?

—কিছু মনে করবে না?

—না।

বললাম, ডাইভোর্স করলে কেমন হয়?

হেসে উঠল, বলল, করলে মন্দ হয় না, বাতিঘরের এই লোকটিকে বিয়ে করা যায়।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন মিস্টার মুখার্জি, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে জানলার

ঝাঁকে গেলেন। বললেন, ওঃ! প্রচণ্ড ঝড়! ওর নৌকোর কী হল কে জানে? দেখি জোরালো আলোটা ফেলে।

আবার সেই খুঁজে-ফেরা-আলো ঘুরতে লাগল সমুদ্রের বুকে, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন মুখার্জি, বললেন, নাঃ, নৌকোর দেখা নেই। কী যে হল!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল বাইরে একটা ভারী পদশব্দ। আমরা চমকে চাইতেই দেখি, সেই বেয়ারাটা হুড়মড় করে ঘরে এসে ঢুকল, সমস্ত শরীরটা ভিজে সপসপে, নিদারুণ পরিশ্রমে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। আর তার পিছনে পিছনেই এলেন একটি মহিলা। ইনিও পরিশ্রান্ত মনে হল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়িটা সুঠাম শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন, এসেছ! আমি ভেবে ভেবে অস্থির। সরাসরি বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে ভালই করেছ, জানতে পারলাম যে তুমি আসতে পেরেছ। খুব কষ্ট হয়েছে, না? যাও, ঘরে চলে যাও।

মেয়েটি কবাট ধরে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, দরজা ছেড়ে চলা শুরু করতেই মুখার্জি বলে উঠল, ভাল কথা, দাঁড়াও, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার বন্ধু মিঃ ব্যানার্জি, আর ইনিই হচ্ছেন আপনাদের মিসেস মুখার্জি।

নমস্কার বিনিময়ের পর বেয়ারার সঙ্গে মেয়েটি চলে যেতেই আমি বলে উঠলাম, আপনার কাহিনীর দুটি নায়িকার কাউকেই আমি দেখি নি, কিন্তু তবুও মনে হল এঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ কী রকম করে হল?

চেয়ারে নিজেকে পরিপূর্ণ এলিয়ে দিয়ে মুখার্জি বলতে লাগলেন, খুব অবাক হচ্ছেন, না?

ভাবতে গিয়ে আমি নিজেও অবাক হই। কিন্তু ট্রুথ্‌ ইজ্‌ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শান। আমি ওকে জয় করি নি, প্রকৃতপক্ষে ও-ই আমাকে জয় করেছে। শুনুন তা হলে।

দিনের পর দিন ওইভাবে কাটে, কিন্তু আমার হাহাকার শান্ত হয় না।

যে আশ্চর্য রাতটির কথা বলে এ কাহিনীর শেষ করব, সে এক বিদারুণ রাত আমার পক্ষে। ভাবছিলাম ওদের বারে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি মদ খাব—যদি এ জ্বালা একটুও শান্ত হয়? যদি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি? ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছি চিরদিন, মনে মনে বলতে লাগলাম, কেন এ ভালবাসা আমার হৃদয়ে এনে দিলে? কেন আমার মনটাকে পাথর করে দাও নি? কেন এমন কোমল মন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছ তুমি!...আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম সে রাত্রে। হঠাৎ দেখি, কপালে আবার কার স্নিগ্ধ করস্পর্শ। বুঝলাম, কিন্তু বাধা দিলাম না। ধীরে ধীরে শিয়রে বসে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওরও চোখে জল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ও আমার দিকে তাকাল, কী মমতাময় স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি! আমি চুপ করে নিথর হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে একটু যেন ম্লান হাসল, তারপরে আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়াল, এবং তারপরেই অবাক কাণ্ড, আমার সেই হাতটি নিয়ে নিজেই নিজের গালে সজোরে বসিয়ে দিল চড়! কিন্তু ওর দেহটা টলে পড়বার আগেই ওকে আমি দু হাতের নিবিড় বাঁধনে বেঁধে ফেলেছি, ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠেছি, সারা—সারা!

সেই মারাত্মক চিঠিটা আমার বুক থেকে কখন যেন পড়ে গিয়েছিল মেঝের ওপরে। সেটি তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, চিঠি একখানা পেয়েছিলাম এবং সেটাই বোধ হয় ওর অভিজ্ঞান। মিস্টার সিনা হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন, ও-ও চলে গেল হঠাৎ—আমি পেলাম ওর চিঠি। তার সঠিক ভাষা হুবহু আপনাকে আজ বলতে পারব না, যতটুকু মনে করতে পারি ততটুকু বলব আপনাকে।

"মিতু, তোমাকে আমি একদিন বনমানুষের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? মেয়েরা যে বনমানুষকেও শেষ পর্যন্ত পছন্দ করতে পারে, তার প্রমাণ আমি। আমি ডাইভোর্সই করতাম, কিন্তু ওঁর কাছে আমাকে তিলে তিলে এগিয়ে দিয়েছ তুমি। উনি আমাকে পছন্দ করেন নি, বড়

ছুয় না হয়ে আমাকে ছুঁতে পারতেন না। কিন্তু আমি? আমি কী করব? আমি তো মদ খেতে পারব না। সে যে কী অন্তর্দ্বন্দ্বের দিন গেছে তা বর্ণনা করা যায় না। আকুল হয়ে কেঁদেছি, মন শান্ত হয় নি। দেয়ালে পাগলের মত মাথা ঠুকেছি, তবু ভিতরের হাহাকার ঘোচে নি। এমন দিনে কী এক বিচিত্র লগ্নে বিচিত্র দ্বীপে তোমার সঙ্গে আলাপ। শেষ পর্যন্ত তুমিই হয়ে পড়লে আমার মদ। তোমার আদরে দেহে যখন আগুন জ্বলত, কামনায় সমস্ত সত্তা যখন অস্থির হয়ে উঠত, তখন তোমাকে ঠেলে ফেলে ছুটে চলে যেতাম আমার বনমানুষের কোলে। মিস্টার সিনা সমস্ত বুঝত, তাই তোমার সঙ্গে মেলামেশায় সে কোনদিন অখুশী হয় নি। এই রকম করে করে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম সিনার কাছে। আজ তো সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তোমাকে ধন্যবাদ মিতু।"

চিঠির কথা শেষ করে এক মুহূর্ত থেমে থেকে মুখার্জি বললেন, সারা আমাকে বাঁচিয়েছে। ওকে না পেলে হয়তো উন্মাদ হয়ে যেতাম, না হয় আত্মহত্যা করতাম। ঝড়-বৃষ্টি থেমে এসেছে। আজ আপনি আমাদের অতিথি। ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, কী সুন্দর বাংলা শিখেছে ও। কী মশাই, কী ভাবছেন?

শোনা যায়, অদূরভবিষ্যতে যা ঘটবে তার আভাস অনেক সময় নাকি আগে থাকতেই পাওয়া যায়। হঠাৎ-মুখ-দিয়ে-বেরিয়ে-যাওয়া টুকরো কোন কথার মধ্যেও নাকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পায় অনেকে। আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে সেদিন ওই-রকম হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, আপনি ভাগ্যবান, তাই এই প্রেমের আশ্রয় পেয়েছিলেন অবশেষে, কিন্তু যারা সেটা না পায়?

রসদ্বীপের সেই খুঁজে-ফেরা-আলো, হয়তো আজও ঘুরে মরে সমুদ্রের বুকে, কিন্তু সেদিনের মত আজও বোধ হয় খুঁজে পায় নি আমার চরম প্রশ্নের উত্তর। সম্ভবত এ যুগে পাওয়াও যাবে না।

কানাগলির একটি রাত্রি

দুটি রাস্তার মোড়। মোড়ের বাঁ দিকের রাস্তাটা সারি সারি সাত-আটটা বাড়ি পেরিয়ে হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে একটা সেকেলে থাম-বসানো পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে। বাড়িটার সামনে ছিল কিছু ফাঁকা জমি, ধবধবে-সাদা-পাথরের-কুঁচি বসানো একটা খেলাঘরের পাহাড়ও তৈরী করা ছিল, ছিল ঝরনা। কিন্তু সে-সব ভেঙে দিয়ে কংক্রিটের ঘর তৈরী হয়েছে, একটা গ্যারেজ হয়েছে, চকচকে চকোলেট রঙের একটা মোটর থাকে সেই গ্যারেজে—পাথরের কুচিগুলি দেয়ালের এক পাশে বহুদিন জড়ো করা ছিল, পাড়ার ছেলেদের খেলার সামগ্রী হিসাবে একে একে হারিয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে এদিক-ওদিক। বাড়ির সামনের ওই নতুন গ্যারেজঘর আর ওই প্রকাণ্ড লোহার গেটটা যেন থাম-বসানো ইঁটের-কঙ্কাল-বার-হওয়া বাড়িটার সামনে একেবারেই বেমানান।

সেদিন রাত্রে গঙ্গাইদের ডিউটি পড়েছিল এই কানাগলিটারই মধ্যে।

একটা সাধারণ লণ্ঠন, আর-একটা টকটকে লাল রঙের চিমনি-বসানো লণ্ঠন—পিতাপুত্রে এই দুটো লণ্ঠন দুজনে হাতে ঝুলিয়ে কাঁধে লম্বা বাঁখারি আর যন্ত্রপাতি নিয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এসে ঢুকেছিল গলিটার মধ্যে। যথারীতি রাস্তার নীচের ড্রেনের ম্যানহোল-ডোরটা সরিয়ে ফেলে দুজনেই ঢুকেছিল ড্রেনটার মধ্যে। ভ্যাপসা পচা দম-বন্ধ-হয়ে-আসা দুর্গন্ধ—বেশ কিছুক্ষণ ড্রেনের মুখটা খোলা রেখে বাইরের হাওয়া ভাল করে খেলতে দিয়ে ড্রেনের বেড় বেয়ে মরচে-ধরা লোহার আংটা ধরে ধরে সাবধানে নীচে নামবার নিয়ম।

ওপরের পথ দিয়ে যারা হাঁটে, ওপরের পথ দিয়ে যারা ঠুং-ঠাং করে রিক্‌শা নিয়ে যায়, হর্ন বাজিয়ে যারা চালিয়ে যায় ওপরের পথ দিয়ে মোটরগাড়ি কিংবা ভারী ভারী মাল-বওয়া লরি—তারা সেই দ্রুত

চলবার মুহূর্তে কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না, পথের নীচে ড্রেনের তলায় কর্মে-নিরত এই মানুষগুলির অবস্থা কী!

ম্যানহোলের পাশে জ্বলে লাল লণ্ঠনের আলো, তবু তার পাশ কাটিয়ে গাড়ি চলে গেলে নীচে কাজ করতে করতে মনে হবে, ঝড় চলে গেল বুঝি একটা; কিংবা এক এক সময়ে মনে হয়, ভূকম্পনই হচ্ছে বুঝি বা; কখনও-বা মনে হয়, ইঁটের গাঁথুনি এই মুহূর্তে সবসুদ্ধ ভেঙে-চুরে মাথার ওপরেই বুঝি পড়ে!

ময়লায়-ময়লায় নিকষ কালো হয়ে গেছে ড্রেনের জল। বাঁখারি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্রোতোধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ময়লার স্তূপ ছোট ঝুড়ি করে উঠিয়ে ফেলতে হবে রাস্তার ওপরে।

কানাগলির ড্রেনের গাঁথুনি ছোট ছোট সেকেলে ধরনের ইঁটের তৈরী। গঙ্গাই হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করে, ইঁটের প্রান্তগুলি ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে।

গঙ্গাই বৃদ্ধ, তার ছেলে বস্‌রাজ নওজোয়ান। বললে, বাপু, তুই ওপরে গিয়ে বোস্, বাঁখারি যোগান দে, আমি কাম চালু করে দিই।

তাই হয়। গঙ্গাই ওপরে উঠে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নেয় প্রথমে। তারপর উঠিয়ে-সরিয়ে-রাখা ম্যানহোলডোরটার পাশে লাল লণ্ঠনটাকে ভাল করে বসিয়ে রেখে দেয়। তারপরে উঁচু হয়ে বসে পায়ের পাতার নীচে চেপে লম্বা বাঁখারিটা বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চালিয়ে দিতে থাকে ম্যানহোলের মধ্যে।

এই-ই নিয়ম। একজন থাকবে নীচে, অপরজন ওপরে। নীচের লোক যখন ক্লান্ত বোধ করে ওপরে উঠে আসবে, তখন ওপরের লোক যাবে নীচে।

লাল লণ্ঠনটার দিকে তাকায় গঙ্গাই। লাল লণ্ঠন। লাল লণ্ঠন হচ্ছে সাবধানতার নিশান, হুস্ করে কোন গাড়ি-টাড়ি না হুমড়ি খেয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে!

অবশ্য রাত একটা—যখন চারিদিক নিষুতি হয়ে গেছে, তখন কেই বা আসছে এই নির্জন কানাগলিটার ভিতরে!

জায়গাটা ঠিক কলকাতা নয়, কলকাতার শহরতলি, উপকণ্ঠ বলা যেতে পারে। রাস্তার ম্যানহোলটা যেখানে ওরা খুলেছে, তার সামনেই কর্পোরেশনের মেটারনিটি হোমের লাল বাড়িটা—ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় যাকে বলে, জেনানা হাসপাতাল।

হাসপাতালটার পাশে একটা পুকুর ছিল—কচুরিপানা ভর্তি, রাজ্যের লোক তাতে স্নান করেছে, কাপড় কেচেছে, বাসন মেজেছে, এককোণে ময়লাও ফেলেছে। সম্প্রতি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে পুকুরটা। পুকুর মাঠ মতন হলেও পুরনো পুকুরের লোহার রেলিং জায়গায়-জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার ক্ষয়ে-যাওয়া মরচে-ধরা বাঁকানো-দুমড়ানো অবয়ব নিয়ে।

এই বুজে-যাওয়া পুকুরের মাঠেই দিনকতক হল জায়গা নিয়েছে একদল ভবঘুরে স্ত্রী-পুরুষ। পুকুরপাড়ের সেই যে বুড়ো শিমুলগাছটা ঝাঁকড়া-মাথা ডালপালা নিয়ে পুকুরের দিকে মুখ করে নিজের ছায়া দেখত, তারই কোল ঘেঁষে আস্তানা বিছিয়েছে ওরা—লোহার রেলিংয়ের ওপর দিনের বেলা শুকোয় ওদের শাড়ি, ঘাঘরা, ধুতি, জামা, নাচ-দেখানো পোষা-বাঁদরের ক্ষুদে টুপি, ফতুয়া এইসব।

ওদের চেঁচামেচি আর হই-হুল্লোড় এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও শোনা যাচ্ছিল। এখন সব চুপচাপ। সবাই বোধ হয় চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, পোষা-ছাগল বা বাঁদরের কিচির-মিচিরও স্তব্ধ।

অদ্ভুত জাত এই ভবঘুরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে, এমনি করে করে দল বেঁধে হাঁড়িকুঁড়ি-চলমান-সংসারসুদ্ধ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পেশাও অদ্ভুত। জাদু দেখায়, বাঁদর-নাচ দেখায়, রামছাগলের সার্কাস দেখায়, মেয়েরা দেয় নানান ধরনের জটিল অসুখের জন্য মাদুলি আর জড়িবুটি। বাচ্চারা করে ভিক্ষে। এক-একটা দলে থাকে দশ-পনেরো, এমন কি বিশজন পর্যন্ত লোক, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে। মেয়েদের শাড়ি-পরার ধরন একেবারে বাঙালীর মত, বাংলা বলেও পরিষ্কার, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যখন বলে, তখন বোঝা দুষ্কর ওদের ভাষা। ওরা কোন্ দেশী জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওরা মারাঠী। ওদের মেয়েদের নাম—

গাংনী, ধগুনী এইসব। ছেলেদের নাম—ছয়লা, চম্মু এই ধরনের। যেমন, এই কিছু আগেও যে মেয়েটা দলের একটা ছেলে—ছয়লাই বোধ হয় নাম—তার রঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছিল, তার নাম হচ্ছে, গাংনী। কিন্তু থাক্, গাংনীর কথা পরে হবে।

রাত এখন কত? হ্যাঁ, তা একটা বেজে গেছে এতক্ষণে। খোলা ম্যানহোলটার কাছে লাল লণ্ঠনটার পাশে বসে বসে এবার একটু ঝিমুতে শুরু করল গঙ্গাই। গঙ্গাই ওই জেনানা হাসপাতালটার পিছনে যে ধাঙড়-বস্তি, তাতেই একখানা ঘর নিয়ে থাকে—ছেলে বস্‌রাজকে সঙ্গে নিয়ে। আর-কেউ নেই তাদের, বস্‌রাজের মা মারা গেছে বহুদিন আগে, বস্‌রাজের সাদিও এতদিনে দিতে পারে নি গঙ্গাই টাকার অভাবে। পিতা আর পুত্র—দুজনের সংসার। গঙ্গাইয়ের স্নেহটা পুত্রের ওপর খুবই বেশী, সে একাই যে ওর মা-বাপ। বস্‌রাজও বাপকে ছাড়া জানে না কাউকে। বাপের পরামর্শ আর উপদেশ ছাড়া চলে না এক-পা। উপার্জনের সব পয়সা বাপের হাতে আগে এনে তুলে দেয়, বাপকে না বলে একটা পয়সাও খরচ করে না।

আজকের রাত্রে অবশ্য কাজ পড়েছে নিজেদেরই পাড়ার মধ্যে বলতে গেলে, অন্য দিন অনেক দূরে দূরে যেতে হয়। অবশ্য এ পাড়াটাকে ঠিক নিজেদের পাড়া বলাও ভুল হবে, এ পাড়ার কাকেই বা তারা ভাল করে চেনে?

গঙ্গাই গায়ের ওপরে ধুতির খুঁটটা জড়িয়ে এবার একবার হাঁক দিয়ে সাড়া নিল ছেলের—বস্‌রাজ হো! নীচের ম্যানহোল থেকে সাড়া এল—হো বাপু।

—হোই!

রাতের কাজে নামলে একটু-আধটু নেশা-টেশা না করলে চলে না। তাড়ির ভাঁড় শেষ করে এসে বসে ছিল গঙ্গাই। সেই রাত নটার কাছাকাছি সময় থেকে শুরু হয়েছে কাজ। কাজ যখন শুরু করল তারা, রাস্তায় গাংনীরা ছাড়া আর-কোন লোক ছিল না বললেই চলে, গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা।

ম্যানহোলডোরটা উঠিয়ে ওরা দুজনে একসঙ্গেই নেমেছিল ড্রেনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে ওপরে যখন উঠে আসছিল গঙ্গাই লোহার আংটাগুলো ধরে ধরে একের পর এক পা ফেলে ফেলে, হঠাৎ কী-রকম যেন ফিস্‌ফিস্‌-করা কথা কানে যেতেই ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল লোহার আংটার ওপরে।—ঠিক ম্যানহোলটার পাশে দাঁড়িয়ে কে বা কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। মাথাটা উঁচু করে যতদূর দেখা যায় ম্যানহোলের গহ্বরমুখ থেকে, তাতে করে দেখতে পেল, কালো-শাড়ি-পরা সুগৌর দুখানি পা, আর তার কাছ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে একটি পুরুষ—ঝক্‌ঝকে পালিশের জুতো তার পায়ে।

—এ কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! ভয় করছে নাকি?

স্ত্রী-কণ্ঠের উত্তর এল, ইস্‌! ভয় আবার কাকে? সে তো রাত একটার আগে কোনওদিন বাড়ি ফেরে না। কী হচ্ছে এখানে? ধাঙড়রা কাজ করছে বুঝি?

দ্বিতীয় প্রশ্নটির কোন উত্তর না দিয়ে পুরুষটি বললে, আর দীনু চাকর যদি বলে দেয়?

তীব্র কণ্ঠে মেয়েটি উত্তর দিলে, বলুক। আমি তো তাই চাই। বুকে খোঁচা খেলে তবুও যদি হুঁশ ফেরে! নইলে রাত্রের শো-তে তোমার সঙ্গে বেছে বেছে সিনেমায় যাওয়া—

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল ওদের কণ্ঠস্বর, গঙ্গাই উঠে পড়েছিল রাস্তার ওপরে। ওরা দুজনে অনেকটা দূর চলে গেছে। ঘোমটা-মাথায় অল্পবয়সী একটি বউ, আর ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরা একটি ভদ্রলোক।

এদের দুজনকেই আবার দেখেছিল গঙ্গাই রাতের সিনেমা ভাঙবার পরে, রাত তখন প্রায় বারোটা হবে কি হয়ে গেছে। একটা রিক্‌শায় বসে আসছিল দুজনে ঠুং-ঠুং করে। নিঃঝুম হয়ে বসে আছে সে চুপচাপ, আর রিক্‌শাটা এসে থেমেছিল তারই কাছে, লাল লণ্ঠনটা একটু পেরিয়ে।

—এই, থাম।

—এখানে কেন? বাড়ি পর্যন্ত যাবে না?

বউটি বললে, না। এখানেই নেমে পড়ি। তুমি চলে যাও মৃন্ময়দা। আর এসো না। আমি ডাকলেও আর এসো না।

—কে হবে তোমার সিনেমা দেখার সঙ্গী ?

—কেউ না। দরকার নেই আমার সিনেমা দেখে। দরকার নেই আমার সঙ্গীর।—কেমন যেন কান্না-ভরা শোনাল বউটির কণ্ঠস্বর, সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল সেই থাম-বসানো গ্যারেজ-ওয়ালা পুরনো দোতলা বাড়িটার দিকে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল, জ্বলে উঠল ওদের বাইরের আলোটা। একটা বুড়ো মতন লোক—চাকরবাকরই হবে হয়তো—এসে দরজা খুলে দিল, বউটি চলে গেল বাড়ির মধ্যে। আর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু লক্ষ্য করল ভদ্রলোকটি, তারপর রিক্শার ওপরে উঠে নিজেকে কেমন-যেন ক্লান্ত ভঙ্গীতে এলিয়ে দিল রিক্শার সীটে, বলে উঠল, মুখ ঘোরাও। ফিরে চল।

ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করতে করতে চলে গেল রিক্শাটা লাল লণ্ঠনটার পাশ কাটিয়ে।

—বস্‌রাজ হো!

—হোই বাপু!

আবার চুপচাপ হয়ে গেল গলিটা। জেনানা হাসপাতালের ভিতর থেকে একটি মেয়ের কাতরানি শোনা যাচ্ছে শুধু। খোলা মাঠের মধ্যে চাদর-মুড়ি-দেওয়া গাংনীদের দলে কোন সাড়া নেই।

রাত বাড়তে লাগল। ম্যানহোলটার দিকে তাকাতে তাকাতে গঙ্গাইয়ের একসময়ে মনে হল, ওটা ম্যানহোল নয়, শহরটার বুকে একটা ঘা হয়েছে প্রকাণ্ড, আর তার ছেলে সেই ঘায়ের পোকা তুলে তুলে ঘা-টা সারাবার বন্দোবস্ত করছে।

—বস্‌রাজ হো!

—হোই বাপু।

ঠিক তার পরক্ষণেই ঘটল ঘটনাটা। মোড়ের দিক থেকে মোটর গাড়ির জোরালো দুটো চোখের আলো হঠাৎ এসে পড়ে শুধু গঙ্গাই

নয়, গঙ্গাইদের গলিটাকেই যেন ধাঁধিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে। তীব্র অস্বস্তি বোধ করে সেই দিকে জোর করে তাকাতে তাকাতে মোটরের যিনি চালক তার কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পেল গঙ্গাই! বাব্বাঃ! কী জোরালো আলো! সেই বুকের-ঘায়ের ফোটো তোলার ঘরে ডাক্তার-বাবুদের যে জোরালো আলোগুলো জ্বলে, তার চেয়েও এ জোরালো। কিন্তু পরক্ষণেই নিবে গেল আলো। মোটরের দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দও শোনা গেল। প্যান্ট-কোট-পরা বাবুটি বুঝি বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে।

কিছু বলবেন নাকি তিনি ওদের?

উস্কোখুস্কো চুল, জোয়ান বয়সের বাবুই হবে—একটা সিগারেট ঠোঁটে আটকে দেশলাই দিয়ে সেটা ধরাতে যাচ্ছেন, কিন্তু ধরাতে পারছেন না, কেঁপে যাচ্ছে হাত, পাও যাচ্ছে টলে টলে।

শেষ পর্যন্ত অসীম বিরক্তিতে দেশলাই আর সিগারেট দুটোই ছুঁড়ে ফেললেন বাবুটি, জড়িত কণ্ঠে কী একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে এলেন গঙ্গাইয়ের দিকে, তারপর লাল লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন জড়িত স্বরে, কী বাবা, ট্রাফিক বন্ধ? লাল বাতি জ্বলছে! জ্বলুক, আমি বসি।

বলতে বলতে বাস্তবিকই ফুটপাথের ওপরে বসে পড়লেন বাবুটি, বললেন, কার উদ্দেশে কে জানে—বাবা ট্রাফিক-কনেস্টবল দাদা, লাল সিগন্যালটা সবুজ হলেই বোল, উঠে পড়ব, গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দেব, তার পরেই বাস্, ওই আমার তেতলা বাড়ি, আমি আর বউ, বউ আর আমি—এইটুকু বাসা করেছিনু আশা।

বাবুটির দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গঙ্গাই। জেনানা হাসপাতাল থেকে মেয়ে-কণ্ঠের কাতরানি তখনও শোনা যাচ্ছে। আজব গলি; গঙ্গাই মনে মনে ভাবে—এই মাতোয়ালা বাবু আর ওই বেদেদের মেয়েটা গাংনী; চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী ঝগড়াই না করতে পারে! মেয়েটার চিৎকার যেন এখনও কানে বাজে। ব্যাপারটা কী? না, ছেলেটা তাকে শাদি করতে চেয়েছে। বাস্, আর যায় কোথায়?

শাদি মানে বিয়ে? বিয়ে করতে চাস আমাকে? সেদিনের ছোকরা, উপার্জন করার মুরোদ নেই, আবার বিয়ে? কেন, গাংনী কি ফেল্‌না মেয়ে? হ্যাঁ, রীতিমত লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল ওদের মাঠে। কাজ ফেলে বস্‌রাজও ম্যানহোল থেকে উঠে এসেছিল ওপরে: কী হয়েছে রে বাপু?

—ও বেদেদের গোলমাল। তুই তোর কাজ কর্।

কিন্তু শোনে নি সে কথা তার জোয়ান লেড়কা। ছুটে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। সে নিজেও কি চুপচাপ থাকতে পেরেছিল?

যাই, দেখেই আসি ব্যাপারটা, ছেলেটা যখন ছুটে গেল, তখন আমি কি—

বৃদ্ধও গিয়েছিল। মেয়ে নয়তো, যেন গোখরো সাপ! কোমরে হাত দিয়ে কেমন উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে তীব্রকণ্ঠে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে বেঁকেই বা দাঁড়ায় কেন ওই মেয়ে? কী যেন নাম? হ্যাঁ, গাংনী। বলছে, বিয়ে কর্, বেশ তো এখানেই বিয়ে কর্। তোর সঙ্গে থাকব, তোর ভাত রেঁধে দেব, তুই রেগে গিয়ে চড়-চাপড়টা মারলে সহ্যও করব, কিন্তু তাই বলে, বলে কিনা—দুজনে চুপি চুপি পালিয়ে যাই চল্। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি, ডেরা বাঁধি কোথাও, অনেক দূর দেশে গিয়ে। কেন রে হতভাগা বেদে, আমি তোর সঙ্গে পালিয়ে যাব কেন বিয়ে করে, অ্যাঁ? বল্ না চাচা, আবার সোহাগ জানাতে এসেছে! যা ভাগ্, দূর হ।

এমন ভাবে ছেলেটার দিকে তেড়ে গিয়েছিল ওই গাংনী মেয়েটা যে গঙ্গাইয়ের বুকটাই দুরুদুরু করে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি বস্‌রাজের হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল আবার রাস্তার এই ম্যানহোলের কাজে।

কিন্তু বস্‌রাজের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল গঙ্গাই। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে, বিশ্বসংসারের আর কোন দিকে ওর যেন চোখ নেই। না না, এ ভাল কথা নয়। তাদের বস্তির মেয়েদের কারুর দিকেই বরং দৃষ্টি ফেলুক বস্‌রাজ, এসব

মেয়ের দিকে মন দেওয়া ঠিক নয়। এদের কি ঘরে রাখা যায় বেঁধে? এরা যে মনে-প্রাণে যাযাবর!

তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ওকে টেনে এনেছিল গঙ্গাই, বলেছিল, বেটা বস্‌রাজ, তোর মা নেই, ঘরে বহুও নেই, তোর শাদি দেব ভাল মেয়ে দেখে, হ্যাঁ? এখন কাজ কর্ বেটা।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল গঙ্গাইয়ের। জেনানা হাসপাতালে সেই মেয়েটি আর-একবার দুঃসহ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু মাত্র একবার, তার পর-মুহূর্তেই রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল একটি শিশুর কান্না—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া!

গঙ্গাই কল্পনা করতে পারে মেয়েটির মুখ। ওর মুখখানা বোধ হয় এতক্ষণে পরম তৃপ্তির আশায় ভরে উঠেছে। পর-মুহূর্তে সেই ফুটপাথে-বসে-পড়া বড়লোক বাবুটি জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, কী বাবা কনেস্টবল দাদা, ট্রাফিক কি ছেড়ে দিয়েছে? লাল আলো কি সবুজ হয়েছে?

গঙ্গাইর ইচ্ছা হল বাবুটির কাছে গিয়ে বলে, বাবুজী, উঠুন, ট্রাফিক-উফিক কুছু না, জ্বলছে স্রেফ একটা লাল লণ্ঠন, ওর পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে আপনি এগিয়ে যান, গিয়ে গাড়িটা তুলে দিন গ্যারেজে।

কিন্তু না, কী ভেবে গঙ্গাই আর গেল না বাবুটির কাছে, ঘাঁটাল না তাকে। কী জানি মাতোয়ালা আদমী, যদি আচমকা ঘুষি-টুসি মেরে দেয়! একবার এ-রকম ভাবে এক বাবু-মাতালের ঘুষি খেয়েওছিল গঙ্গাই।

কিন্তু ওদিকে করছে কী বস্‌রাজ? গঙ্গাই আবার সাড়া নিতে হাঁক দিয়ে উঠল—বস্‌রাজ হো!

আশ্চর্য! সাড়া এল না। সচকিত হয়ে আবার চিৎকার করে উঠল গঙ্গাই—বস্‌রাজ হো!

এবারেও সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি ম্যানহোলের মুখের দিকে ঝুঁকে ছেলের খোঁজ করতে লাগল গঙ্গাই। চিৎকার করে উঠল—বস্‌রাজ হো!

বেদেদের দিক থেকে হল্লা উঠল, কে চিল্লাচ্ছে অমন করে? ঘুমতেও দেবেন না, না কি?

বলতে-না-বলতে গায়ের চাদর ফেলে অসীম বিরক্তিতে যে ছুটে এল সে আর কেউ নয়—গাংনী।

—কা হয়েছে বুড়ো, চিলাচ্ছিস কেন?

মেয়েটার পিছন-পিছন পায়ে-পায়ে উঠে এসেছিল বেদেদের সেই ছেলেটা, যার সঙ্গে ওর ঝগড়া, যে ওকে চেয়েছিল বিয়ে করতে। গঙ্গাই কিছু উত্তর দেবার আগেই মুখ ফেরাতে গিয়ে গাংনী দেখে ফেলল ছেলেটাকে। রাগে যেন ফুলতে লাগল সঙ্গে সঙ্গেঃ—ফের এসেছিস আমার পিছু-পিছু? বলতে-না-বলতেই এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে ছেলেটার গালে মারল এক চড়। তারপর দুমদাম পা ফেলে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। অন্য বেদেরা মড়ার মত ঘুমুচ্ছে।

চমক ভেঙে সেই বাবুটি আবার বলে উঠল, কী বাবা, ট্রাফিক খুলল? লালবাতি সবুজ হল? অনেকক্ষণ থেকে যে গাড়ি থামিয়েই রয়েছি বাবা।

ম্যানহোলের মধ্যে ঝুঁকে গঙ্গাই আবার ডেকে উঠল—বস্‌রাজ হো!

কোন ক্রমে নীচের থেকে ভাঙা গলায় জবাব দিলে বস্‌রাজ, হোই!

জবাব দেবার মত মনের অবস্থা সত্যিই তার নয়, থরথর করে সে কাঁপছে, চোখ দুটোও তার বিস্ফারিত। ময়লা পরিষ্কার করতে করতে সে যা পেয়েছে, তা অভাবনীয়। চোখের সামনে হাতের মুঠোটুকু এনে খুলে ধরল বস্‌রাজ—ছোট একটি আংটি, ঝকঝক করছে; আংটিটা সোনার, কিন্তু এ কথা বাবুকে কী সে বলবে? না। এটা সে কিন্তু কার কাছে বিক্রি করতে যাবে? যদি চোরাই মাল বলে পুলিসে দেয়? না না, এ কী হল—এ কী হল!

—বস্‌রাজ হো!

—হোই!

তরতর করে ওপরে উঠে এল বস্‌রাজ।

কী হয়েছে রে বেটা?

—বাবু, হাঁপ লাগছে। একটু জিরোই।

—হাঁ হাঁ, জিরিয়ে নে, আমি এবার নামি। তুই বসে থাক্।

গঙ্গাই কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে সত্যিই নীচে নেমে গেল। বললে, মাঝে মাঝে সাড়া নিস বেটা। ময়লার গ্যাস লেগে না বেহুঁশ হয়ে পড়ি।

ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। সোনার আংটি তো নয়, যেন ওই বেদেদের মেয়ে গাংনীর মুখখানাই জ্বলজ্বল করে উঠল ওর চোখের সামনে। যেন বিদ্যুতের শিখা, তাদের বস্তির মেয়েদের মত মিয়নো নয়। ভাল লাগে না তাদের। কত টাকা? কত টাকা 'লগন' দিলে তাদের হাতে তুলে দেবে ওই গাংনীকে তার বাপা? এই আংটিটা যখন মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান, তখন ওকেই যা তিনি মিলিয়ে দেবেন না কেন? চেষ্টা করলে হয় না? ওকে পেলে পুরনো বস্তি ছেড়ে দেবে বস্‌রাজ। নতুন কোনও মহল্লায় গিয়ে ঘর বাঁধবে। আরও খাটবে বস্‌রাজ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। গাংনীকে সে কী সুখী করতে পারবে না?....কিন্তু গাংনী যদি রাজী না হয় ওভাবে ঘর বাঁধতে? তা হলে ওদেরই সঙ্গে সে গিয়ে থাকবে, বেদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। এই সোনার আংটি দিয়েও কি সে মন পাবে না গাংনীর? দুটি চোখ ভরে যেন স্বপ্ন নামে। বার বার মন চায় উচ্চারণ করতে,—গাংনী—গাংনী—গাংনী—

হাতের মুঠিটা চোখের কাছে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে খুলল বস্‌রাজ—সত্যিই এটা সোনার তো? উত্তেজনায় তার বুকটা কামারের হাপরের মত ওঠানামা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার কানে এল জড়িত এক কণ্ঠস্বর।

—কী বাবা, ট্রাফিক খুলল, লালবাতি সবুজ হল? এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরে নিদারুণ চম্‌কে উঠল বস্‌রাজ।

চমকটা এত প্রবল হল যে মুহূর্তের মধ্যে তার কাঁপা হাত থেকে আংটিটা আবার পড়ে গেল ম্যানহোলের মধ্যে গড়াতে-গড়াতে। আর্ত চিৎকার করে উঠল বস্‌রাজ: বাপু!

—কেয়া বেটা?

তরতর করে বস্‌রাজও গেল নীচে নেমে: বাবু, সোনার একটি আংটি।

—আংটি কাঁহা ?

—পেয়েছিলাম। এইমাত্র হাত ফসকে পড়ে গেল নর্দমার মধ্যে। এস বাবু, দুজনে খুঁজি।

পাগলের মত খুঁজতে লাগল দুজনে। গঙ্গাইয়ের মনে হল তা হলে অনেক দেনা শোধ করা যায় আংটি পেলে। বিক্রি করতে গেলে পুলিসে ধরবে? ধরুক। এ তার যক্ষের ধন। ভগবান দিয়েছে। ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত করে দুজনে নর্দমা ঘেঁটে প্রাণপণে খুঁজতে লাগল আংটিটা।

প্রহর পার হতে লাগল আর শেষ হয়ে আসতে লাগল রাত। ওদের তবু খোঁজার বিরাম নেই।

তন্দ্রা ভেঙে হঠাৎ চমকে উঠল স্যুট-পরা সেই লোকটা : কী বাবা, ট্রাফিক খুলল ? কিন্তু কোথায় সেই কনেস্টবল্ ? কোথায় লুকলে বাবা ? এই যে বসে ছিলে ?

সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল, দুটি লোক—একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। চুপি চুপি পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হয়ে যাচ্ছে : কে বাবা তোমরা ? কোথায় যাচ্ছ ?—এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনে পড়ল লোকটি —ট্রাফিক বন্ধ। যেতে তো পারবে না। লাল আলো জ্বলছে। কিন্তু ছেলে আর মেয়ে দুটি যাবেই, এ যেতে দেবে না। ক্রমে গুঞ্জন দাঁড়াল চিৎকারে। লোকটি চিৎকার করছে : ট্রাফিক বন্ধ। দেখছ না লাল আলো জ্বলছে! ওর চিৎকারে জেগে গেছে বেদেদের দল, তারা ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।—এ কী গাংনী! ছয়লা! কোথায় যাচ্ছিস ? হ্যাঁ, যাকে চড় মেরেছিল তারই সঙ্গে পালাচ্ছিল গাংনী।

ততক্ষণে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে রাস্তায়। লোকের জটলা বেড়েছে। গঙ্গাই আর বস্‌রাজ ম্যানহোল বেয়ে ওপরে এল। এত করেও তারা খুঁজে পেল না আংটিটা।

ধপ করে রাস্তার ওপর বসে পড়ল বস্‌রাজ। কিন্তু ওদের হয়েছে কী! কিসের এত জটলা বেদেদের দলে ?

গাংনী আর ছয়লা। ওদের বোঝাচ্ছে ওদের দলের লোক, ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁবুর দিকে।

সমস্ত কথাই কানে এল বস্‌রাজের। গাংনী আর ছয়লা। তবে কি গাংনী মেয়েটা মনে মনে ভালবাসত ছয়লাকে!

গঙ্গাই কিন্তু দেখছে সেই বড়লোক বাবুটিকে। তার হাত ধরে তাকে মোটর গাড়িটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই বউটি। চিনতে পেরেছে গঙ্গাই। ওই গ্যারেজওয়ালা তেতলা বাড়ির সেই বউটি। বউটি তার স্বামীকে বলছে, সারারাত এ-ভাবে রাস্তায় কাটালে! চল, বাড়ি চল। এই দীনু, বাবুকে ধর্।

দীনুকে তো চিনল গঙ্গাই। তেতলা বাড়িটার সেই বুড়ো চাকরটা। বাবুটি মোটরের দিকে যেতে যেতে তখনও বললে, ট্রাফিক কি খুলেছে? লাল বাতি কি সবুজ হয়েছে?

বাবুটিকে ওরা গাড়িতে ওঠাচ্ছে, আর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বস্‌রাজ, আংটিটা কিছুতেই পাওয়া গেল না,—পেয়েও হারাল সে।

সেই অচেনা মেয়েটি

চরম বিচ্ছেদের আবেদনপত্র যথারীতি সই করেছিলাম, ধীরেশবাবু সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েও গেলেন, আর উনি? উনিও চুপচাপ বসে রইলেন অভ্যাগত কোন পরিজনের মত আমার সেলাইয়ের টেবিলের সামনের চেয়ারটায়। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বাইরের আলো পাণ্ডুর হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল, রাস্তার কোন আলোর ছটা ওঁর পাঞ্জাবির সোনার একটা বোতামের ওপর আবছা এসে পড়ে ঝিলমিল করে উঠল। বোধ হয়, তারপরই উনি উঠে দাঁড়ালেন, ঘর ছেড়ে ওঁর নিজের ঘরে যেতে যেতে বললেন, অন্ধকার। আলোটা জেলে নাও।

রাত বাড়তে লাগল। আমার ঘুঙুর দুটো টেবিলের ওপর পড়ে ছিল, ও-দুটো তুলে টিনের বাক্সে রেখে দিতে গিয়ে একটা ঘুঙুর হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে বিশ্রী একটা শব্দ তুলল।

বিকেলের স্কুলে সেদিন আর যাওয়া হয় নি, যে দুটি মেয়েকে 'ভারতনাট্যম্' শেখাই, তারা নিশ্চয় স্কুলে এসে আমার জন্য কিছুক্ষণ বসে থেকে নিজেদের মধ্যে আজে-বাজে গল্প করে—হয়তো আমাকে নিয়েই ওদের মনোমত গল্প, অবশেষে ওরা বাড়ি ফিরে গেছে। নাচের স্কুলের মালিক ও অধ্যক্ষ প্রৌঢ় আদিত্যবাবু আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই ঘর আর বার করেছেন, কারণ আমার গত তিন বছরের নৃত্য-শিক্ষকতার জীবনে একটি দিনের জন্যও অনুপস্থিতি ঘটে নি।

স্কুল আমার দুটি। সকাল আর বিকেল। সকালের স্কুলটা হচ্ছে সুরুচিদির। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত এমন কে আছেন যে তাঁর নাম শোনেন নি? কিন্তু আমি তো গান শিখি নি, আজীবন ধরে যা শিখেছি তা নাচ, এবং নাচের মধ্যেও অন্য নাচে আমার তেমন দক্ষতা নেই, যেটা যত্ন নিয়ে মাদ্রাজে দীর্ঘদিন থেকে শিখেছিলাম, সে হচ্ছে ভারতনাট্যম্।

কিন্তু সুরুচিদি ছাড়বেন না, ছোট মেয়েদের প্রাথমিক নৃত্যশিক্ষা দিতে হবে আমাকেই।

ভাবছিলাম, কাল সকালেও কি সুরুচিদির স্কুলে যেতে পারব? ওখানেও তা হলে ঘটবে গত তিন বছরের কর্মজীবনে একটি দিনের অনুপস্থিতি।

কিন্তু কী-ই বা করা যায়? মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও ক্লান্তিতে ভরে ছিল সেদিন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে এলাম যখন, রাত দশটা বেজে গেছে। উনি ওঁর ঘরে গেছেন যথানিয়মে। হয়তো টেরাকোরা-আর্টের সেই ভাঙা যক্ষিণী-মূর্তিটি এই রাত্রে টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ধরে অতসী কাচ দিয়ে কী কী সব লক্ষ্য করছেন। মূর্তিটি নাকি ভয়ানক দামী, ওঁর কোন এক গবেষণারত সরকারী বন্ধু ওঁকে কিছুদিনের জন্য দেখতে দিয়েছেন গবেষণার সুবিধার জন্য। ডায়মণ্ড-হারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণপুর না কী নামের যেন একটা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে ওই মূর্তি।

উনি ইতিহাসের গবেষক ও অধ্যাপক। কিন্তু এ যাবৎ যা নিয়ে উনি নিজের খেয়ালে গবেষণা করছিলেন, তা হচ্ছে নৃত্য। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে তার স্থাপত্য লক্ষ্য করেছেন। 'মেলাটুর' বলে মাদ্রাজের যে গ্রামে গুরুগৃহে আমি নাচ শিখেছিলাম, সেই গ্রামে গেছেন আমাকে নিয়ে, আমার যিনি 'নট্টুবান' বা নৃত্যশিক্ষক, তাঁর সঙ্গে তো দেখা করেছিলেনই, অন্য 'নট্টুবান'দের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও 'ভারত-নাট্যম্' সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিচ্ছিলেন।

সেদিন বলেছিলাম, এসবের দিকে ঝোঁক হল কেন?

বলেছিলেন, যেজন্য তোমার দিকে ঝুঁকেছিলাম, সেজন্য এসবের দিকেও ঝুঁকছি।

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলাম, ও, মাত্র ঝোঁকের মাথায় আমাকে বিয়ে?

একটু হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ঝোঁকটা কিন্তু ভালবাসার ঝোঁক।

—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট?

হেসে উঠলেন, তারপরে আমার মুখখানা দু হাতে ধরে মুখের ওপর ঝুঁকে কী যেন দেখতে লাগলেন, বললেন, সেটা হয়। অন্তত আমার হয়েছিল, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি। তোমার হয় নি বুঝি?

মনে মনে বলেছিলাম, বলা শক্ত। কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ করতে পারি নি। তাই একটু হেসে ওঁর চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ, তা হয়েছিল আমারও।

উনি আদরে আদরে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলেন। কিন্তু আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এত বড় একজন পণ্ডিত লোক, আমার এই সামান্য কথাটায় ভুলে গেলেন কেমন করে!

পরে, অনেক পরে, ভেবে দেখেছি, পুরুষের কাছে এই উচ্ছ্বাসটাই বুঝি সব। উচ্ছ্বসিত হয়ে কিছু বানিয়ে বললেও তৎক্ষণাৎ ওরা বিশ্বাস করে নেয়।

সেই প্রথম কলকাতায় এসে আমার নাচ দেখানো। বাবা বললেন, খুকী, কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাই। মাত্র এই ছুটিতে-ছাটাতে মাদ্রাজ-কলকাতা, কলকাতা-মাদ্রাজ—আর ভাল লাগছে না।

—তোমার চাকরি?

বাবা বললেন, ট্রান্সফারের চেষ্টা করছি। বোধ হয় পেয়ে যাব।

তা বাবা অবশ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশী দিনের জন্য কি? আবার হঠাৎ একদিন বদলির আদেশ-পত্র এসে পৌঁছল এবং সে আর মাদ্রাজ থেকে নয়, একেবারে ওপার থেকে, যেখান থেকে মানুষ আর ফেরে না। মাকে তো হারিয়েছিলাম ছোটকালেই, এর পর বাবাকেও হারালাম।

ওঁর সঙ্গে বিয়ে অবশ্য ততদিনে হয়ে গেছে। সেই প্রথম দিনের নাচ দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল ওঁর। বাবার সঙ্গে আলাপ করে একরাশ ফুল নিয়ে একবারে আমার গ্রীন-রুমে।

—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট?

বার বার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেতাম, সেটা হয়।

আমার বিয়ে হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সে—আজ আমি আঠাশ।

দেখায় নাকি আরও কম। অবশ্য এটা শোনা কথা—উনিও বলেন, ওঁর বন্ধু ধীরেশবাবুও বলেন। নিজে বুঝতে পারি নে। নিজের যেটা মনে হয়, সেটা চুপিচুপি বলতে পারি। মনে হয়, দশ বছরের ছোট্ট মেয়েটিই আমি আছি, কাঁদছি 'মা-মা' করে—আর বাবা কোলে নিয়ে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন, বলছেন, খুকু, আমিই তোর মা-বাপ। বলতে বলতে নিজেই কেঁদে ফেলেছিলেন ঝরঝর করে।

আট বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান আসে নি, আমিই আসতে দিই নি।

বছর তিনেক আগে একবার টাইফয়েড হয়েছিল। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কী একটা স্নায়বিক রোগও নাকি দেখা দিয়েছিল! ডাক্তার বারণ করে দিয়েছিলেন নাচতে।

চোখ ফেটে কান্না এসেছিল। নাচবই না যদি, তা হলে কী শিখলাম সারা জীবনের সাধনায়? তা ছাড়া বিভিন্ন জলসায় নাচ দেখিয়ে বা কোন কোন নাচের দলের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরে কিংবা দু-তিনটি ছায়াছবিতে বিশিষ্ট একক নৃত্য প্রদর্শন করে অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই অর্জিত হচ্ছিল মন্দ নয়। বললাম, নাচ ছেড়ে দেব? তুমিও বলছ?

উনি বললেন, তা আমি কোনদিনই বলব না। তোমার শিল্পী-জীবনকে ব্যর্থ করার অধিকার আমার নেই। তা ছাড়া, তোমার কোন কাজে বাধা তো আমি দিই নি।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু মনে হল, কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত অভিমানও যেন ফুটে উঠল।

মনের মধ্যে বুঝি ঝড় বইছিল, একে শারীরিক দুর্বলতা, তার ওপরে এই মানসিক উত্তেজনা। ওঁর দুটি হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠেছিলাম, কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে?

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ, মুখখানা যেন আকস্মিক বেদনার আঘাতে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে দ্বিগুণ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেদিন রাত্রে আমার 'ফিট'ও হয়েছিল।

ধীরেশবাবু ওঁর বন্ধু। অদ্ভুত লোক, ওকালতিও করেন, অধ্যাপনাও করেন, পত্রিকায় পত্রিকায় মনস্তত্ত্বের ওপর সারগর্ভ প্রবন্ধও লেখেন। আবার পাড়ার গরিবদের হোমিওপ্যাথির বই দেখে বিনা পয়সায় ওষুধও দেন। বিয়ে-থা করেন নি, চিরকুমারই থাকবার নাকি ইচ্ছা ; কিন্তু বয়স সম্প্রতি চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়ায়, হঠাৎ মত বদলাতে শুরু করেছেন। বলেন, সত্যি কথা বলব মিসেস চৌধুরী ? মনের মত মেয়ে পাই তো বিয়ে করি। নীচের তলাটা পুরো ভাড়া দিয়েছি, ওপর তলাকার চারখানা ঘর একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

হেসে বলেছিলাম, ভাড়া দিন না।

—না না, ভাড়া নয়।—হাসতে হাসতে বলে উঠেছিলেন, নিজেকে দিয়েই ভরাতে চাই।

—কী রকম!

উনিও ছিলেন আমার পাশে বসে, বললেন, এটা বুঝলে না ? ধীরেশ বিয়ে করে এক থেকে বহু হতে চায়।

কথাটা বুঝতে পেরে লজ্জায় বোধ হয় রাঙা হয়ে উঠেছিল আমার মুখ। ওঁর গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে জনান্তিকে বলে উঠেছিলাম, যাঃ! অসভ্য!

হাসছিলেন তখনও উনি, বললেন, যাই বল, ছেলেপিলে না হলে ঘর মানায় না।

ওঁরা দুজনে মহা কৌতুকে হাসছিলেন। কিন্তু আমার সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, চারদিকে প্রবল ষড়যন্ত্র চলেছে। এর প্রতিরোধ করতেই হবে।

মাথাধরার অজুহাতে নিজের ঘরে এসে খিল দিয়েছিলাম। আঁচলটা বুক থেকে নামিয়ে ফেলে আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখেছিলাম সেদিন।

সত্যি কথা বলতে কী, গর্বই হচ্ছিল মনে মনে। মাথায় সিঁদুর আর হাতে লোহা না থাকলে আজও আমাকে বিবাহিত বলে ভাবা শক্ত—পুরুষদের পক্ষে তো বটেই, মেয়েদেরও ভ্রম হতে পারে।

আধুনিক লেখকরা আমাকে নিয়ে গল্প লিখলে, আমাকে বর্ণনা করতে

বসে রীতিমত সুন্দরীই বলে বসবেন—এ আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি। কেন? সেই যে কী-সব সিনেমা-পত্রিকা হয়েছে আজকাল, যা বেরোলে নাকি পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে কিনে নেয় অনেকে, তার একটিতে কিছুদিন আগে আমার ছবি ছাপিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে আমার দেহ-লাবণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখই হয়ে উঠেছিলেন লেখক।

অস্বাভাবিক নয়। ধীরেশবাবু প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসেন ঠিক ঘড়ি ধরে রাত আটটায়, দু ঘণ্টা গল্প করে ঠিক দশটায় বাড়ি ফিরে যান। বলেন, সারাদিনের খাটুনির পর এটুকুই আমার রিক্রিয়েশন অর্থাৎ নিজেকে নতুন করে উজ্জীবিত করা।

হাসিমুখে বলতাম, কিন্তু ঠিক আটটা কেন ধীরেশবাবু?

বলতেন, ওই যে আপনি স্কুল সেরে আটটার মধ্যে ফিরে আসেন।

বলতাম, তা হলে আমিই?

—কী?

—আপনার রিক্রিয়েশন?

বলতেন, আপনারা দুজনেই। দুজনেই মিলিত একটি সুর।

উনি সকৌতুকে বলতেন, ভণ্ড কোথাকার! আমার ওপর তোর টান? রোববার আসিস?

বলতেন, না, রোববারটা কোথাও আসা-আসি নয়। ও দিনটা আমি নিজেকে নিয়ে কাটাই। ওটা আমার আত্মদর্শনের দিন। আর তা ছাড়া রোববারটা নিছক তোমাদেরই দুজনের থাকা দরকার। টু ইজ কোম্পানি, থ্রী ইজ নান্।

উনি বলতেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

ধীরেশবাবু মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যেতেন, বলতেন, না। ওটা দরকার।

তারপরেই আবার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলতেন, মিসেস চৌধুরী কিন্তু গ্রেট ইন্সপিরেশন।

—কী রকম?

ধীরেশবাবু আমার প্রশ্নে আমার দিকে ফিরে বলতেন, দেখছেন না আপনার কর্তার দশা! কী নিয়ে পড়াশুনা করত, আর আপনাকে বিয়ে

করার পর থেকে ও এই আট বৎসর ধরে 'ভারতনাট্যম্' নিয়ে পড়েছে। ঘোরাঘুরি করতে আর বই কিনতে ও কি কম পয়সা নষ্ট করেছে!

—কী যে বলেন!

লজ্জিত হয়ে কথাটা বললেও মনে মনে ভয়ানক খুশী হতাম। ওঁর 'ভারতনাট্যম্' সম্পর্কে এই ঔৎসুক্য, এর খুঁটিনাটি, এর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, এর সুবিস্তৃত ও সুবিচিত্র ইতিহাস জানবার ওঁর বিপুল আগ্রহ যে এই আমি, নিছক এই মেয়েমানুষটিকেই জানবার নামান্তর, এটা বুঝতে আমার ভুল হত না। প্রেমের এই অদ্ভুত এক দিগন্তের বিকাশ আমাকে মনে মনে এত অভিভূত করত যে, আমি আরও বেশী নাচের অনুশীলনে ডুবে যেতাম, আরও বিচিত্র ও কঠিন ভঙ্গিমা অনুক্ষণ আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা করতাম।

আহারে-বিহারে নিয়ম মেনে চলা আর এই নৃত্যের শ্রম আর অভ্যাস, এবং ভারতনাট্যমেরই অনুপূরক হিসাবে পরিমিত কুম্ভক ও রেচক এই যৌগিক প্রক্রিয়া যে আমার দেহচ্ছন্দকে অপরূপ করে রাখবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

তার প্রতিফলন দেখতাম ধীরেশবাবুর চোখে। গল্প করতে করতে ওঁর দুটি চোখে যে মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখতাম, তার অর্থ বুঝতে নারী হয়ে ভুল করব কেন? প্রশ্রয় দিতাম না বটে, নিবারণও করতাম না। মনে হত, মুগ্ধ ভক্তের নীরব পুষ্পাঞ্জলি এসে আমার পায়ে পড়ছে।

ঘর-সংসার আমি দেখতাম না, তার জন্য ঝি ছিল, রাঁধুনী ছিল। আর তা ছাড়া সংসার তো দুটি লোকের—আমি আর উনি। আমার দেওর বা ভাসুররা নানান জায়গায় থাকেন, বিশেষ আসেনও না। গত আট বছর ধরেই এটা দেখে আসছি। আমাকে বিয়ে করায় তাঁদের ভাইয়ের প্রতি তাঁরা খুশী নন। শ্বশুর নেই, বিধবা শাশুড়ী তাঁর বড় ছেলের কাছে সুদূর পুনায় পড়ে আছেন, কলকাতা আসেনও না, মাঝে মাঝে চিঠি আসে শুধু তাঁর।

সেদিন শুয়ে শুয়ে সমস্ত অতীতটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে

ছায়াছবির মত। টাইফয়েডের পর নিজে নাচ দেখানো ছেড়েছি বটে, কিন্তু নাচ শেখানো ধরেছি। বাড়ি বসে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারব না, সে উনি জানতেন। গত তিন বছর ধরে চলেছে আমার শিক্ষকতা। কিন্তু শিক্ষকতা চললেও, অন্য এক ঝড় চলেছিল সংসারে। অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের মানসিকতার ঝঞ্ঝা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে ভিতরে বিপর্যস্ত করে দেয়।

বিবাহের পঞ্চম বর্ষ থেকেই এর শুরু হয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম, এবং বুঝেই শুরু হয়েছিল আমার প্রতিরোধ। মুখে উনি কিছু বলতেন না, কিন্তু হাবে-ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হত, উনি কী চাইতেন।

বলতাম, আমার এই জীবন আমি নষ্ট করব ?

চমকে উত্তর দিতেন, কোন্ জীবন ?

বলতাম, তুমি কী চাও, আমি কি তা বুঝি না ? পারব না, পারব না নষ্ট করতে আমাকে।

বলে কেঁদে উঠে ছুটে চলে আসতাম নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়।

উনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারতেন না, একটু অবাক হয়েই চলে আসতেন পিছনে পিছনে। বলতেন, কী বলছ তুমি মানসী ?

বলতাম, বোঝ না ? কী ভাবে আমি থাকি ? আমার এই 'ফিগার'—

কথা শেষ না করে থেমে যেতেই উনি যেন মুখের দিকে তাকিয়ে বাকিটা বুঝে নিতেন, বলতেন, ও, এই ! না মানু, তুমি তো জান, আমি সে সব চাই না। তোমাকে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট। সন্তান-টন্তানে আমার দরকার নেই।

মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন ওঁর ঘরে, আমি আরও অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম ওঁর চলে যাওয়া। কিন্তু বার বার মনে হত, ঠিক কথা উনি বলেন নি। বৈজ্ঞানিক যুগে সন্তানের জন্ম এড়ানো সম্ভব, আমরাও তা সম্ভব করেছি। অথচ—

বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল সেদিন। বোধ হয়, আবারও ফিট হয়েছিল আমার। গলির মোড়ের তাঁর বাড়ি থেকে আবার ডেকে আনতে হয়েছিল ধীরেশবাবুকে। ধীরেশবাবু আর তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধ।

তিন বছর ধরে ক্রমাগত এই ভাবে সংগ্রাম করতে করতে বিবাহের অষ্টম বর্ষে পড়ে মনে হল, এ চলবে না, চলতে পারে না। বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

উনি বললেন, বেশ। তোমার কোন ইচ্ছায় বাধা দিই নি, আজও দেব না। ধীরেশকে ডাকি। কর লিগ্যাল সেপারেশনের দরখাস্ত।

করলাম। ধীরেশবাবু প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়েছেন তিনি। কোর্টের আদেশ হলেই আলাদা থাকব তিন বছর, তারপরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ।

বললেন, কোর্টের হুকুমটা বেরুক, তখন আলাদা বাড়ির খোঁজ করা যাবে, এখনই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

বলেছিলাম, সে আপনি বুঝবেন না।

ধীরেশবাবু বললেন, আমার দোতলায় চারখানা ঘর। না হয় একখানা ঘর আপনাকেই ভাড়া দেব।

বলেছিলাম, খুবই ভাল। বাড়ির যা প্রব্লেম কলকাতায়।

ধীরেশবাবু বলেছিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কেন এটা করতে যাচ্ছেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি তা বুঝবেন না।

আবেদনপত্র সই করার আগের দিন। ওঁর ঘরে গেছি। সেই তাকিয়া-শোভিত খাটো তক্তাপোশ আর অসংখ্য বই আর খাতাপত্র। হঠাৎ দেখি, বহু পুরনো মাটির একটা ভাঙা পুতুল, লালচে রঙের।

বললাম, এটা কী?

উনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, বললেন, ধোর না, পড়ে গিয়ে ভেঙে যাবে। ওটা একটা যক্ষিণী মূর্তি, বহু পুরাতন যুগের। হরিনারায়ণপুরে পাওয়া গেছে।

তাড়াতাড়ি রেখে দিলাম যথাস্থানে, বললাম, হবে কী ওটা দিয়ে?

বললেন, ওটা দিয়েই তো গবেষণা করছি আজকাল।

—কিসের গবেষণা?

—বাংলার পুরনো ইতিহাসের। জান, কলকাতাকে ঘিরে পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। হরিনারায়ণপুরে গঙ্গার ভাঙনে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, থাক্, শুনতে চাই না।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোনক্রমে কথাটা বলে নিজের ঘরে এসে আবার আশ্রয় করেছিলাম বিছানা। মনে হল, সব আমার চলে গেল। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই মাটিটাই যেন মুহূর্তে সরে গেল পায়ের নীচে থেকে।

ওই যক্ষিণী এসে আমার সমস্ত সত্তাটাকে যেন মুহূর্তে চুরমার করে দিয়ে গেল। কিন্তু ওঁরই বা এই পরিবর্তন কেন? ভারতনাট্যমের গবেষণা ছেড়ে অন্য বিষয়ে এইরকম অখণ্ড মনোনিবেশ?

কিসের এ প্রতিক্রিয়া? আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, কিসের এ প্রতিক্রিয়া। মাত্র আমিই নয়, আরও কিছু ওঁর চাই। সন্তান—সন্তান ওঁর চাই।

কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলেন না কেন?

মুখে সেই ক্ষমাশীল হাসি, চোখে সেই অপার স্নেহ। কে চায় ক্ষমা, কে চায় স্নেহ!

ওই যক্ষিণী মূর্তিটির কথা যত চিন্তা করতে লাগলাম, ততই যেন আগুন ধরে যেতে লাগল মাথায়। মনে হল, এই ঘর, এই আসবাব, এই বাড়ি—এগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিই।

উনি সব শুনে স্থির মনে বলে গেলেন ওঁর কথা। বললেন, আমার নামেই দোষারোপ দিও আবেদনপত্রে। আমার নিষ্ঠুরতা, আমার—

আরও কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন উনি।

গায়ের জামাটা খুলে টকটকে লাল সেই আটপৌরে তাঁতের শাড়িটা পরেই শুয়ে ছিলাম, এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। বুকটা কেমন যেন আপনিই ধড়াস ধড়াস করছে, কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে—চোখেও যেন কেমন

অন্ধকার দেখছি মনে হল। বেডসুইচ টিপে আলোটা জ্বেলেও আঁধার কমছে না। দেয়ালের ঘড়িতে রাত প্রায় তিনটে—টকটক করে পেণ্ডুলামটা প্রহর গুনে যাচ্ছে।

কিন্তু আবার কী ফিট হবে নাকি আমার? কেমন যেন ভয় হল। গরমও লাগলে ভীষণ। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সামনের বারান্দার দরজাটা খুললাম। বারান্দাটা রাস্তার দিকে। বারান্দায় বেরিয়ে বাঁ দিকে ফিরলেই ওর ঘর। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই লালচে আলোর ছটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হল, এত রাতে করছেন কী উনি জেগে?

যাব না মনে করেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে। জানলার পাশেই ওঁর শোবার খাট। দেখি, খাটে উনি নেই, নীচের সেই বই-ছড়ানো তক্তাপোশের ওপরে বই পড়তে পড়তে বই খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ কী?

ঠিক ওঁর মাথার কাছটিতে পা মুড়ে বসে কে একটি মেয়ে পরম যত্নে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে ওঁকে, আর অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ওঁর মুখের দিকে। একরাশ খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপরে, খালি গায়ের ওপর লাল শাড়িটির আঁচলটা জড়ানো।

কে এই মেয়েটি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভুল দেখছি না তো? ভাল করে চোখ মুছে নিয়ে দেখতে লাগলাম—মেয়েটি আঁচলের খুঁট দিয়ে ওর মুখের বিন্দু বিন্দু ঘাম অতি যত্নে মুছে নিচ্ছে।

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করতে লাগল। পাছে ফিট হয়ে পড়ে ওদের ব্যাঘাত ঘটাই, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হতে লাগল। কে—কে—কে এই মেয়েটি? কোথা থেকে এল ও?

লুকিয়ে লুকিয়ে তা হলে এইসব হচ্ছে?

এইজন্যেই বিচ্ছেদের প্রস্তাবে এককথায় ইনি বলতে পেরেছিলেন, আচ্ছা, বেশ।

বেশ। তাই হবে। আমিও মুখ ফুটে কথাটিও কইব না।

আর কইবই বা কেন? আর কী সম্পর্ক রইল ওঁর সঙ্গে আমার?

পরদিন ধীরেনবাবু আসতেই বললাম, কোর্টে দিয়েছেন? কবে নাগাদ আদেশ পাব?

বললেন, শিগগিরিই হবে। ব্যস্ত হবেন না।

ব্যস্তই হয়ে পড়েছি। বললাম, ধীরেশবাবু, আপনি আমায় বাঁচান। আপনার ঘরই কিন্তু ভাড়া নেব। যত শিগগির পারেন এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুন।

ধীরেশবাবু বললেন, কী হয়েছে বলুন তো? অসুস্থ? শুনলাম, ইস্কুলেও যান নি!

—না। কোথাও যাব না। এখান থেকে না বেরুলে কোন কাজই করতে পারব না।

—একটা কথা বলবেন? ধীরেশবাবু বলে উঠলেন, আসল ব্যাপারটা কী?

—সে আপনি বুঝবেন না।—বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে এসেছিলাম নিজের ঘরে। উনি ছিলেন। ওঁতে আর ধীরেশবাবুতে কী কথা হয়েছিল জানি না।

পরদিন। ঠিক সেই রাত তিনটে। দরজা খুলে ওঁর জানলায় গিয়ে আরও কাছ থেকেই মেয়েটিকে দেখলাম। আমার বয়সীই হবে। সুন্দরী। সেইরকম খালি গা, এলো চুল। হলদে একটা শাড়ি পরা। ওঁর খাটের ওপর উনি শুয়ে আছেন। মেয়েটি ঠিক পাশেই শুয়ে। দুটি হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে—

দু হাতে চোখ ঢেকে ছুটে চলে এলাম নিজের ঘরে।

নাঃ, আর দেরি নয়, কোর্টের আদেশ আসুক বা না-আসুক, আমাকে কাল ধীরেশবাবু এলেই ওঁর সঙ্গে চলে যেতে হবে।

সকালেই ডেকে পাঠালাম।

—কী ব্যাপার ?

—ব্যাপার যাই হোক, এক্ষুনি আমাকে নিয়ে চলুন। এক মুহূর্তও টিকতে পারছি না এ বাড়িতে।

বললেন, কোর্ট থেকে আদেশটা নিয়ে আসবই আজ।

তা হলে সন্ধ্যাতেই চলুন।

উনি বললেন সেই এক কথা ঃ বেশ। তাই হোক।

রাত্রে যথারীতি এলেন ধীরেশবাবু। বললেন, আদেশ বেরুবে কাল। কাল পর্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।

দাঁতে দাঁত চেপে কোনক্রমে বললাম, বেশ। তাই হোক।

তারও পরের দিন। ধীরেশবাবুর সারাদিন দেখা নেই। এলেন রাত্রে।

বললেন, ক্ষমা করুন। আরও একটি দিন দেরি হবে।

বললাম, আমি কী করব ? আমি কিছুতেই এখানে থাকব না।

বললেন, কী ব্যবস্থা করবেন ?

—কাল আমিই চলে যাব।

—কোথায় ?

বললাম, সে যেখানেই হোক।

ধীরেশবাবু বললেন, না, তা নয়। আমার বাড়িতেই নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

উনি ছিলেন না কাছে। কথার মাঝে হঠাৎই উঠে চলে গিয়েছিলেন বারান্দায়।

রাত তিনটের সময় যথারীতি ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে ওঁর জানলায় এসে যা দেখলাম, তা কোন মেয়েই সহ্য করতে পারে না। সেই

অচেনা মেয়েটি। খালি গা, এলো চুল, সাদা একটা শাড়ি পরা। ওঁর পাশে খাটের ওপর শুধু শুয়েই নয়—ওঁকে ছু হাতে নিজের দিকে টেনে ব্যাকুল হয়ে বার বার কী যেন বলছে। শুনছে না ওঁর কোন বারণ—শুনছে না ওঁর কোন কথা। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, মেয়েটি বলছে, আমি যে মরে যাচ্ছি! বোঝ না তুমি! সন্তান—ছোট একটি সন্তান চাই আমার কোলে!

প্রচণ্ড একটা শব্দ। আর কিছু মনে নেই। ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম বারান্দার ওপরে।

কী আর বলব, ছুটি দিন নাকি অজ্ঞান অবস্থাতেই কেটে গিয়েছিল আমার। যমে-মানুষে টানাটানি।

যখন চোখ খুললাম, দেখি আমারই বিছানায় আমি শুয়ে। সামনের চেয়ারে বসে ধীরেশবাবু। পাশে আর-একটি চেয়ার। সেটি খালি। সম্ভবত উনিই বসেছিলেন এতক্ষণ।

ধীরেশবাবু বললেন, ভয় নেই। ভাল হয়ে গেছেন। ভয় পেয়েছিলেন, না?

ওঁকে ডেকে আনলেন ধীরেশবাবু। সব শুনলেন আমার কাছ থেকে। কেউ কিছু বললেন না, শুধু ধীরেশবাবুকে কিছুটা চঞ্চল মনে হল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরও কাটল ছুটো দিন। ডাক্তার আর নার্সের ঘন ঘন আনাগোনা। ছু দিন পরে নার্স বিদায় নিল। আমিও উঠে বসলাম।

ধীরেশবাবু বললেন, মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখেছিলেন লাল শাড়ি পরে?

—হ্যাঁ।

—পরদিন দেখেছিলেন হলদে শাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—তার পরদিন সাদা শাড়িতে?

—হ্যাঁ।

ধীরেশবাবু আমার স্বামীকে ডাকলেন। তারপরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আলনার দিকে তাকান তো।

তাকালাম। পাশাপাশি তিনটে আটপৌরে শাড়ি ঝুলছে। লাল, হলদে, সাদা।

বললেন, যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, সে আর-কেউ নয়, সে আপনি নিজে। আপনারই অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবি আপনি দেখেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী।

—আমি? অবাক হয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ ধীরেশবাবুর কথা শুনছি।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ধীরেশবাবু আমার স্বামীর নাম উচ্চারণ করলেন, বললেন, বিচ্ছেদের দরখাস্ত আমি কালই কোর্ট থেকে নাকচ করিয়ে আনছি।

বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমার স্বামী তাকালেন আমার মুখের দিকে! নতুন এক দৃষ্টি। অথবা, দৃষ্টি আমারই নতুন, যা দেখছি, তাই নতুন লাগছে!

নীলাঞ্জন ছায়া

লালদীঘির যে অংশটা ভেঙে নিয়ে বড় বড় লোহার লাইন পাতা হচ্ছে, অফিসের পর সেইখান দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম সেদিন। মাথার ওপরে বিরাট একটা গাছ, তারই ফুলের রেণু, জড়ো-করা লোহাগুলির একপাশে ক্রমাগত ঝরে ঝরে একমুঠো গোলাপী আবীরের মত পড়ে আছে—একটু নিচু হয়ে সেই আবীর হাতে তুলে নিয়ে দেখছিলাম। অফিসে রঙ-তৈরি আর রঙ-চালান বিভাগে কাজ করি আজকাল, তাই রেণু-রেণু রঙের দিকে মনটা আকর্ষিত হয়েছিল সহজেই। মুঠোয় তোলা ঝরা রঙটুকু কাগজে করে নিয়ে গিয়ে কাল অফিসে বড়সাহেবকে দেখালে কেমন হয় ভাবছি, এমন সময়—

ভাবছি, না-দেখা হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। বেশ ছিলাম অফিস, বাড়ি, ট্রাম, বাস আর রবিবারের সিনেমা-দেখার নেশা নিয়ে—অল্প আয়, অল্প আশা, অল্প সুখ, অল্প দুঃখ আর একক জীবনের অল্প চাওয়া। কিন্তু ওর সঙ্গে চার বছর পরে হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে গিয়ে, ওর সব কথা শুনে, ওকে দেখে, ওকে জেনে, এখন মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত-কিছুই এত অল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রাণ-মন এতে বুঝি আর ভরে উঠছে না—আরও কিছু চাই, আরও বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু। অস্থির হয়ে গেছি, অশান্ত হয়ে গেছি—এ যাবৎ যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু ধারণা করেছি—সব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে।

মহীতোষ বলে উঠেছিল, কী হে, চিনতে পারছ না?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ততক্ষণে, বললাম, যদি বলি সত্যিই চিনতে পারছি না, তা হলে কি খুব অন্যায় বলা হবে?

ট্রাউজারের দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে মহীতোষ বলল, ঘাটশিলার সেই আমি একটু বদলে গেছি, না?

বললাম, একটু!

একটু হেসে বললে, তা সবাই বলে না, লোকে বিয়ের পর একটু বদলে যায়! হয়তো তাই একটু বদলেছি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, সুধা কেমন আছে?

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বদলে গেল মহীতোষের মুখের ভাব, ফুলের-রেণু-মাখা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে উঠল, তোর সঙ্গে আমার ভয়ানক দরকার আছে রে অনিমেষ।

একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, কী ব্যাপার!

—তোর সঙ্গে আজ হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে আমার যে কী উপকার হল তা বলার নয়।

ওর আগ্রহের কথা ভেবে নয়, ওর মুখের এই 'উপকার' কথাটা শুনে হঠাৎ একটু হাসিই এসে পড়ল ঠোঁটের কোণে। মনে পড়ল সেই চার বছর আগেকার কথা। ঘাটশিলার কারখানার অফিসে চাকরি করতাম তখন। ডাহিগড়ার যে বাসাটায় থাকতাম, তারই পাশের অংশে থাকত সুধা-রা। মহীতোষ ছবি-আঁকার ইজেল, কাগজপত্র আর রঙের তুলি নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলার অরণ্যের ছবি আঁকবে বলে। হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল আমার সঙ্গে পরিচয়—ওকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করে দিয়েছিলাম সুধাদের সঙ্গে। মহীতোষ সেদিনও এমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল, আমার যে কী উপকার করলে ভাই, তা বলার নয়।

একটু হেসে বললাম, ঘাটশিলা থেকে কবে এলে?

বললে, তা প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল। অফিস করেছি যে এখানে। চল্, তোকে অফিসেই নিয়ে যাই। একটা ছোট্ট কাজ আছে। কাজটা সেরেই বাড়ি যাব। তোকে দেখলে সুধা খুব খুশী হবে।

বললাম, অফিস!

—হ্যাঁ, কাঠ-চালানের ব্যবসা। রেলের স্লিপার সাপ্লাইয়ের কনট্রাক্ট। এক মারোয়াড়ী বন্ধুর সঙ্গে ভাগে—ঝঞ্ঝাট খুব নেই, সাব-কনট্রাক্ট দেওয়া আছে একটা পার্টিকে, পার্টি খুব সাউণ্ড।

ওর সঙ্গে ততক্ষণে পথ চলা শুরু করেছি, একটু থেমে তারপরে বললাম, একটা আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্য করেছ মহীতোষ ?

—কী ?

—বছর খানেক কলকাতায় এসেছ বললে, একটা দিনও তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। রাস্তাঘাটে দেখা হতেও তো পারত।

বললে, ঘাটশিলা ছেড়ে কলকাতা যখন তুমি এসেছিলে, তখন যদি দয়া করে ঠিকানা জানিয়ে একখানা চিঠি দিতে, তা হলে রাস্তাঘাট কেন, একেবারে তোমার বাড়িতেই দেখা হতে পারত।

কটাক্ষটা এড়িয়ে গিয়ে অন্য কথায় এলাম, বললাম, সবই দৈব ঘটনা। তোমার চোখে আমি নাও পড়তে পারতাম—তুমি পাশ কাটিয়ে অনায়াসেই চলে যেতে পারতে।

বাঁকা একটু হেসে বললে, আমার চোখের দৃষ্টি কী রকম জান তো ? কিছুই এড়ায় না। দাঁড়াও অনিমেষ, ট্রাফিক ছেড়ে দিয়েছে—গাড়িগুলো পাস করে যাক—তারপরে রাস্তাটা পার হতে হবে। কিছুদূর এগুলেই আমার অফিস।

অতি সাধারণ দুটি ঘর নিয়ে ছোট্ট অফিস। আমাকে ওর খাসকামরার একটা সবুজ-রেক্সিন-কাপড়ে ঢাকা টেবিলের সামনে বসিয়ে দিয়ে, অন্য ঘরে গিয়ে যে ভদ্রলোকটি খটাখট শব্দের ঝড় তুলে তখনও টাইপ করে চলেছিলেন, তাকে ছুটি দিয়ে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এল মহীতোষ, বলল, তুমি একটু বসে চা খাও, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি একটা জরুরী কাজ সেরে। যাব আর আসব। আমার সেই মারোয়াড়ী পার্টনারের গদিতে যাব। এই কাছেই।

মহীতোষ চলে যাবার পর আমি স্থাণুর মত বসে রইলাম কিছুক্ষণ। যারা সব-কিছু গ্রন্থিমোচন করে চলে যায়, তারা আবার হঠাৎ ফিরে আসে কেন জীবনে ? সুধা আর মহীতোষ, ওদের অধ্যায় তো জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছিল চার বছর আগে, আবার হঠাৎ তারা এমন করে ফিরে এল কেন ? কেন মহীতোষ তাকে আগ্রহ করে নিয়ে এল তার অফিসে,

কেন সুধার সেই হাসি-হাসি মুখখানা আবার মনে পড়ে গেল? সেই [illegible] বুকের ওপর দিয়ে ছুটে-আসা হু-হু হাওয়া এসে সুধার এলানো চুলের অরণ্যে খেলা করে গেল, কী এক দুরন্ত আনন্দে সুধা উঠল খুশী হয়ে, হাতের চুড়িগুলি ক্ষণিকের জন্য সেতারের আচমকা এক ঝঙ্কারের মত বেজে উঠল, বলে উঠল—কী সুন্দর, না?

ওপারের সেই সিদ্ধেশ্বর ডুংরীর উত্তুঙ্গ শিরে ম্লানায়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

বলল, জান? সেতার মানে সপ্ততার। সপ্ততার থেকে সাত তার, তাই থেকে সেতার। আমার সেতার বাজানো শুনে তোমার ভাল লাগে, আজ এখন কী মনে হচ্ছে জান? আমি যেন নিজেই সেই সপ্ততার হয়ে গেছি। আমার সমস্ত শরীর মন যেন একসঙ্গে বাজতে আরম্ভ করেছে! এ রকম নির্জন নদীর ধারে এলে কিংবা পাহাড়ে উঠলে কিংবা বনে বেড়াতে গেলে আমার ভিতরটা যেন কেমন হয়ে যায়! কী করি বল তো এই মন নিয়ে?

ভুলে গিয়েছিলাম, আবার সব একে একে মনের তটভূমিকায় ভেসে উঠছে। বোধ হয় কিছুই হারায় না, সবই মন-মক্ষিকা তার গোপন ভাণ্ডারে জমা করে রাখে। হঠাৎ কখন সুধা ঝরে পড়ে সেই ভাণ্ডার থেকে, তারই আস্বাদে আবার মধুময় হয়ে ওঠে বিশ্বজগৎ, প্রতিদিনের দেখা সূর্যের রঙ নতুন হয়ে দেখা দেয়, চির-চেনা চাঁদ নতুন কথা বলতে শুরু করে।

নতুন বর্ষার জল-পাওয়া কুর্চিফুল খোঁপায় সাজিয়ে সেদিন আমার ঘরে এসেছিল সুধা, সন্ধ্যা হব-হব, অফিস থেকে সবে ফিরেছি, বলল, ও-বাড়িতে একটা নতুন ভাড়াটে এসেছে, জান? লম্বা লম্বা মাথার চুল, বাগানে বসে ছবি আঁকে! শালগাছে কচি কচি পাতা জাগছে, আর পুরনো পাতা টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে, লোকটা তাই আঁকবার চেষ্টা করছিল। দূর, তাই কি আঁকা যায় নাকি? দুটো একসঙ্গে? হয় ঝরা পাতা আঁক, নয় নতুন পাতা, তাই না? ও কী, চুপ করে আছ? কথা কইছ না যে?

বললাম, পরিচয় হয়েছে আমার সঙ্গে। পরিচয় কেন, বন্ধুত্বও বলতে পার।

খিলখিল করে হঠাৎ হেসে উঠল, বলল, কখন হল ওসব? এই পরিচয় আর বন্ধুত্ব? আমি কিছুই জানতে পারি নি।

উত্তর দিলাম, কখন যে কী হয়, তা কি সব সময়ে জানা যায়?

কৌতুকে উজ্জ্বল ছুটি চোখ, মুখ টিপে একটু হেসে বলল, তাই বুঝি!

আমি আর-কোন কথা না বলে অন্য ঘরে গিয়েছিলাম চলে, কী একটা হাতের কাজ সেরে চাকরটাকে চা-তৈরির কথা বলে ফিরে এসে দেখি, সুধা তেমনি বসে আছে আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে। আর, ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি সেদিন। ওর সেই বসে থাকার ভঙ্গি, ওর সেই চোখ-তুলে-তাকানো দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, হায় রে, আমি যদি শিল্পী হতাম!

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডাকলাম, সুধা!

—উঁ?

—ওই শিল্পীটির সঙ্গে আলাপ করবে?

—ওমা, কেন?

—ও তোমার ছবি আঁকবে।

মুহূর্তে উদ্বেল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুধা, বলল, আমার কি ছবি আঁকবার মত চেহারা?

—নয়?

—দূর।

আমাকে কিন্তু সেদিন ভাবালুতায় পেয়ে বসেছিল, বলেছিলাম, তোমাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে ছবি আঁকা যায়!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। শাল-মহুয়ার কচি পাতায় মুকুট তৈরি করে—

বাধা দিয়ে হেসে উঠেছিল, তারপরে বলেছিল, মা গো! আমাকে বুনো মেয়ের সাজে সাজাতে তোমার বুঝি খুব আনন্দ?

বলেছিলাম, তুমি বুনোই। বনপরী।

—ও ব্বাব্বা, মানুষ নই, একেবারে পরী!

—হ্যাঁ, আমি আলাপ করিয়ে দেব তোমাকে ঐ মহীতোষের সঙ্গে। দেখো, কী সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকবে তোমার ও।

মুহূর্তে হাসি থামিয়ে আমার খুব কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, কী দরকার এসব কবিত্ব করে? গরিব বাপের মা-মরা মেয়ে, আমাকে নিয়ে অত মাতামাতি কোর না।

—কোথায় আর মাতামাতি করলুম! তোমার তবু বাপ আছে, ছোট ছোট ভাইবোন আছে, আমার তো কেউ কোথাও নেই। তবু তুমি দিনান্তে একবার আস, খোঁজ নাও, জীবনের একটা ছন্দ খুঁজে পাই।

কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুহূর্ত, বলল, আমার ভাল করে সেতার শিখতে ইচ্ছা করে, জান?

—তা হলে তো কলকাতায় যেতে হয়। সেখানে বড় বড় বাজিয়ে আছে।

—রক্ষে কর, কলকতায় আমি যেতে চাই না। ওই সব পায়রার খোপের মত ঘর, আর কলতলার ঝিরঝির করে জল পড়া! ওরে বাবা! আমি দম আটকে মারা যাব।

ওর হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, চল।

—কোথায়?

—মহীতোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

জুতোর মশমশ শব্দ করতে করতে সুইং-ডোরটা ঠেলে মহীতোষ এসে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল, বলল, এ কী! চা খাও নি?

চমকে চোখ মেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, সত্যি, কখন না জানি ওর বেয়ারাটা চা দিয়ে গেছে। নিজের চেয়ারটায় বসে হাত বাড়িয়ে কাপটা পরীক্ষা করে বললে, থাক্, ও আর খেয়ো না, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আনাচ্ছি—আমিও খাব।

বলেই কলিং বেলটা বার কয়েক টিপল মহীতোষ। লজ্জিত হয়ে বললাম, বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—বহুদিন পরে আমাকে দেখে, না?

—হ্যাঁ, তা বলতে পার। অনেক কথাই ভিড় করে আসছিল মনে।

টেবিলে একটু ঝুঁকে একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে উঠল, তবু তো সব কথা তোমাকে এখনও বলি নি। শুনলে পরে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

একটু থেমে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কী এমন ব্যাপার মহীতোষ, যা তুমি আমাকে—

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হ্যাঁ, পৃথিবীর একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি, আর-কাউকে নয়। মনে মনে তোকে যে আমি কদিন ধরে কত খুঁজছি, তা বলার নয়। প্রভিডেন্স ঠিক সময়মতই তোকে মিলিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে বেয়ারাটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে তারপরে আবার আমার দিকে ফিরল, বলল, ঘাটশিলার সেই রিচ্‌পাল মাড়োয়ারীর কথা মনে আছে? তার এক ভাইয়ের ছবি এঁকে দিয়েছিলাম, সেই থেকে আলাপ। সেই ভাই-ই আমার কারবারের শরিক। টাকা ওরই, আমি হচ্ছি ওয়ার্কিং পার্টনার, এও প্রভিডেন্স, কী বল?

বললাম, প্রভিডেন্স তো সবই। সুধার সঙ্গে আলাপ, সুধাকে বিয়ে, এও প্রভিডেন্স বলতে পার।

—সুধাকে বিয়ে!—দুরন্ত উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল মহীতোষ, বলল, গ্রেটেস্ট ব্লাণ্ডার ইন মাই লাইফ।

আমি যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম, কী বললে! বললে কী তুমি!

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তারপর শান্ত গলায় বলল, বোস। সব বলছি।

ওর নির্দেশে ধপ করে বসে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি মনে আছে। ও-ও বলে নি, মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছিল। ততক্ষণে বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেছে। তারপর কয়েকটা চুমুকে সেই চা তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠে দাঁড়াল, বলল, আর-একটু বোস। আমার অফিসে ফোন-কানেকশন এখনও পাই নি, আমার

পার্টনারের গদিতে ফোন আছে, সেটাই ব্যবহার করি। একটা ট্রাঙ্ক কল করতে হবে নাগপুরের এক পার্টিকে, সেটা করেই ফিরে আসছি। তারপরে বাড়ি যাব। অনেক কথা আছে।

ওর সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম, তা না হয় বসছি। কিন্তু একটা কথা বলে যাও। সুধার শরীর ভাল আছে তো?

—শরীর!—বাঁকা একটু হেসে বলল, কোয়াইট চার্মিং!

পরক্ষণেই সুইং-ডোরটা ঠেলে বেরিয়ে গেল মহীতোষ। ডোরটা দু-একবার দুলে তারপর স্থিরভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

কারখানার অফিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য গল্প করতে আসত সুধা, কিংবা ওর বাবার অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেত কখনও-সখনও। সেদিন ঘরে বসে আমার ফুলদানিতে কী-সব রঙবেরঙের ফুল রাখতে রাখতে বলে উঠল, জান?

—কী?

—আমার ভুরু দুটো নাকি আঁকবার মত, তোমার মহীতোষ বন্ধু বলছিল।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, আর চোখ?

আমার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তারপরে বলল, ছাই। চোখ নাকি আঁকবার মতই নয়।

ওর হাত দুটি হাতে নিয়ে বলেছিলাম, শিল্পীর নিজেরই চোখ নেই দেখা যাচ্ছে, নইলে—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, যাক, আর কবিত্ব করতে হবে না।

আর-এক দিন এসে বলল, জান? তোমার মহীতোষ বন্ধু সত্যি সত্যি আমার ছবি আঁকা শুরু করেছে।

ভারি ভাল লাগল কথাটায়। সুন্দরী কেউ বলে না সুধাকে, ওর গায়ের বর্ণও খুব ফরসা নয়, আবার ময়লাও নয়। কিন্তু আমার ওকে দেখে বার বার এ কথা মনে হত, কী একটা অদ্ভুত বস্তু আছে ওর মধ্যে, যা অন্য কোন মেয়ের মধ্যে আমি কখনও দেখি নি। কারখানার কেরানী—

সেই 'অদ্ভুত বস্তু'টির স্বরূপ বুঝতে পারতাম না, তাই শরণাপন্ন হয়েছিলাম শিল্পীর। মহীতোষ শিল্পী, জানতাম, আমার হয়ে সব ও বলতে পারবে। আমার মনের কথা ওর তুলির টানে ধরা পড়বে। আমি সেই ধরাপড়া রূপশ্রী দেখিয়ে ওকে বলব, দেখলে তো, তুমি কী?

বলল, আমাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল চোখের সামনে তোমার মহীতোষ বন্ধু। বলেছিল, খোঁপা চলবে না। চুল খুলে দিন, হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়তে থাকুক। আর, বাঁ পাটা একটু এগিয়ে দিন, যেন পথ চলছেন আপনি। আপনার চলার ছন্দটাকে ছবিতে ধরে রাখব। আমি তো কথা শুনে অবাক! বাবা কাছেই বসে ছিল, বলল—দাঁড়া না খুকী, যেমন করে বলছে তেমনি করে দাঁড়া না, ওর কথা না শুনলে তোর ছবি ও আঁকবে কী করে! আচ্ছা, বল তো?

—কী?

—চলার ছন্দ মানে কী? আমার নাকি হাঁটার ধরনটা ভাল! ছাই!

বললাম, শিল্পী ঠিকই বলেছে। কিন্তু শোন। একটা কথা। তোমার ছবিটা আঁকা হলে আমি নেব, মহীতোষকে আমার বলাই আছে। সেই কথার ওপরই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি ওর হাতে।

হেসে উঠল, বলল, ছাই। ছবিটা বাবা নেবে। বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবে।

—কেন?

—কেন আবার কী? বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না? পাত্রপক্ষদের দেখাবে।

ভিতরটা ধক করে উঠেছিল, একটুক্ষণ থেমে তারপরে বলেছিলাম, কাকাবাবুর সঙ্গে রোজই তো অফিসে দেখা হয়, কত কী আলোচনা করি টিফিনের সময়, কই, এ কথা তো শুনি নি!

—কী কথা?

—এই বিয়ের কথা।

মুখ টিপে হেসে বলল, বাবা এসব কথা নিয়ে ঢাক পিটোবে, না?

কণ্ঠে জোর এনে বললাম, যাই বল, বিয়ে তোমার হবে না।

কৌতুকে চোখ দুটো যেন হেসে হেসে উঠল, বলল, তার মানে?

—তার মানেটা মুখ ফুটে বলতে হবে? তোমাকে-আমাকে নিয়ে এখানে রটনা কী কম—সম্বন্ধওয়ালাদের কানে গেলে আর কি তারা এগবে? তখন শেষ পর্যন্ত—

কৃত্রিম কোপে চোখে কটাক্ষ এনে কী এক অদ্ভুতভাবে বলে উঠেছিল, ইস্ গো!

মহীতোষ তখনও ঘাটশিলায় আসে নি, এক মেঘমলিন রবিবারের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে ফুলডুংরীর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। কথা ছিল ধারাগিরির দিকে হেঁটে হেঁটে সাঁওতালদের গহনডিহি গ্রামটা পর্যন্ত যাব। তারপর ফিরে আসব। নির্জন বনের পথে সেই চুপচাপ চলার কথা কখনও ভুলতে পারব না। যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল সুধা। বলেছিল, জান? আর-জন্মে আমি বোধ হয় ওই বুনোদের ঘরেই জন্মেছিলাম। নইলে বন এত ভাল লাগে কেন? দেখ, দেখ, বেগুনী রঙের কী অদ্ভুত বুনো ফুল!

আমরা মূল পথ ছেড়ে একেবারে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, বললাম, বনে ভয়ও আছে। বাঘ-ভালুক বেরিয়ে পড়তে পারে!

—তা হোক। তুমি ফুলগুলো আমায় তুলে দাও না, খোঁপায় পরব।

তারপরে বলেছিল, কেউ যদি দেখে ফেলে আমাদের?

—দেখবার মত কেউ নেই। বিপথ দিয়ে চলেছি, একটা সাঁওতাল মাঝিও এপথে চলছে না। ভাল হল না কিন্তু, বনের মধ্যে ভীষণ পথ ভুল হয়। পথ হারিয়ে শেষে কি জন্তু-জানোয়ারের পেটে পড়ব?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ তুলে একেবারে জড়িয়ে ধরল আমাকে, বলল, ওরে বাবা, ওটা কী! একটা পাহাড়ী ঝরনা বয়ে চলেছিল আমাদের পাশ দিয়ে, তারই ওপারে একটা ঝোপের পাশে—

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেই বিস্ফারিত চোখ দুটির দিকে। বোধ

হয় জল খেতে এসেছিল, হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে, তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে আমাদের দেখে। ছোট্ট একটা হরিণ। বোধ হয় শিশুই হবে। কী স্বচ্ছ অবাক-হওয়া দুটি চোখ! কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই ছুটে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল হরিণটা। আনন্দে ও একেবারে লাফিয়ে উঠেছে, বলল, হরিণ!

ওর হাত শক্ত করে ধরে বললাম, আর এগনো ঠিক না, চল ফিরি।

ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, আরও দেখব। আমি হরিণ কখনও দেখি নি, তা জান?

—সে কি আর আছে! পালিয়েছে। চল, তোমার কি ভয়ডর নেই!

—কিসের?

—বাঘটাঘ বেরিয়ে পড়তে পারে। এভাবে আসা মোটেই ঠিক হয় নি।

ফেরার পথে ও আসছিল আমার হাত ধরে, বলল কেমন যেন গভীর একটা কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে, আমাকে এখানে রেখে তুমি চলে যাও।

—কেন?

—অনেক—অনেকদিন পরে ফিরে এস আমাকে খুঁজতে। দেখবে আমি বুনো হয়ে গেছি। বনফুলের গয়না পরে বাঁশী-হাতে-করা এক বুনোছেলের সঙ্গে পায়ে-চলা বুনো পথ ধরে সেই ধারাগিরি পাহাড়ের দিকে চলেছি।

তিরস্কারের সুরে বলেছিলাম, এসব কল্পনা তোমার মনে আসে কেন?

উত্তরে একটি কথাও আর বলে নি।

লোকালয়ের কাছাকাছি এসে আমিই নীরবতা ভঙ্গ করেছিলাম প্রথম, বলেছিলাম, কাকাবাবু যদি জানতে পারে আমরা বনের মধ্যে গিয়েছিলাম, তা হলে কী হবে?

ম্লান একটু হেসে বললে, আমার পিঠের ছাল উঠবে, আবার কী হবে!

—কাকাবাবুকে বলে আসা উচিত ছিল। তোমার-আমার বেড়ানো নিয়ে অমত করেন কি?

—খুব যে মত্ত থাকে সব সময়, তাও নয়। তবে বনে-টনে এভাবে বেড়ানো, কোন্ বাপ সহ্য করবে বল ?

ওর সঙ্গে আলাপ হবার কিছুদিন পরেই মহীতোষ বলেছিল, আমার মস্ত উপকার করলে ভাই অনিমেষ। এ-রকম মেয়ে দেখি নি। আমার মধ্যে যে শিল্পী আছে, তার ঠিক মনের মত মেয়ে। ওকে মডেল করে অনেক ছবিই আমি আঁকতে পারব।

মনে মনে সেদিন বলেছিলাম, তুমি শিল্পী বলেই এ কথা বলতে পারলে। আমি শিল্পী হলে আমিও এ কথা বলতে পারতাম। কিন্তু পোড়-খাওয়া সাধারণ জীবন আমার, বয়সের থেকেও প্রবীণ আমার মন। আবেগের থেকে দ্বিধাটা বেশী, প্রেরণার থেকে বোধ হয় সংশয়টা বেশী। চাকরি-না-পাওয়া জীবনে যখন মুড়ি চিবিয়ে দিন কাটাতাম, তখনই চিত্তের সমস্ত রস বুঝি শুষে নিয়েছিল দারিদ্র্য। তাই কোন-কিছু করবার আগে ভাবতাম বড্ড বেশী। আর ভাবতাম বেশী বলেই ক্রমে ক্রমে একদিন মনে হল—সুধাকে ঘরে আনা আমার পক্ষে যত সহজ, ওকে সুখী করা কিন্তু ততই কঠিন।

এ-কথাটা মহীতোষ আসবার পর থেকে যত দিন যেতে লাগল, ততই মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এক রবিবার আমরা অর্থাৎ আমি মহীতোষ কাকাবাবু, সুধা আর সুধার ভাইবোন, সবাই মিলে গরুর গাড়িতে করে ধারাগিরিতে গিয়েছিলাম বনভোজন করতে। হাতির পায়ের দাগ কিংবা চিতাবাঘের পায়ের দাগ আবিষ্কার করে যত না খুশী হয়েছিল সুধা, তার থেকে খুশী হয়েছিল মহীতোষের সেই ধারাগিরির ঝরনাটাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই এঁকে ফেলা দেখে।

পরের দিন সুধা আমাকে এসে বলল, তোমার বন্ধু শুধু ছবিই আঁকতে পারে না, কথাও বলতে পারে খুব।

—কী রকম ?

—বলব তোমাকে ?

—বলই না।

—বললে, তোমার ছবি তো অনেক আঁকলুম, কিন্তু আরও এমন সব রয়ে গেল যে ছবিতে ধরা গেল না। বললাম, কী? তা বললে, তোমার গলার স্বর।

পরক্ষণেই খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, আচ্ছা, আমার গলার স্বর নাকি ঝরনার ঝরঝর সুরের মত মিষ্টি?

ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, আবার এ-ও সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বাঃ! ঠিক কথাটাই তো বলেছে মহীতোষ! এ তো আমারও বলার কথা। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিকমত বলতে পারি না। এইজন্যই ও শিল্পী, আর আমি কিছুই না। একটু হেসে বললাম, বোস সুধা। আজকাল তো আসা তোমার কমেই গেছে।

—বা রে, সময় পেলে তো? তোমার বন্ধু তো প্রায়ই এসে বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। সেই সময় আমার চৌকাঠের বাইরে পা দেবার জো থাকে নাকি? বাবার হাঁকডাক শুরু হয়ে যায় না অমনি!

বেশ মনে আছে, চাকরি ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম একেবারে। যে কোনও একটা চাকরি। ঘাটশিলা আমাকে এবার ছাড়তেই হবে। কাকাবাবু আর সুধার জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য সংযোগ ছিল। কম কথা তো আর রটে নি সুধা আর আমাকে নিয়ে, তাই—

কিন্তু সুধার এ কলঙ্কমোচনের ভার আমার ওপর এসে পড়লেও মহীতোষের আবির্ভাব তার সব-কিছুকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। মহীতোষ যদি ওকে বিয়ে করে তো ভালবেসেই বিয়ে করবে, শত রটনাও ওর মনকে বিষাক্ত করে তুলতে পারবে না। ওর শিল্পী-মনই সব-কিছু জয় করতে পারবে।

সুধা বলেছিল, তোমার বন্ধু একটা খ্যাপা লোক। খামখেয়ালী লোক। এমনটি আর দেখি নি।

বলেছিলাম, তোমরা বিয়ে কর।

—যোৎ!—বলেই ছুটে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল সুধা।

মহীতোষ সুইং-ডোরটা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল, এ কী, আলোটা জ্বাল নি? চুপচাপ অন্ধকারে বসে আছ? উঠে এস। আর দেরি নয়, বাড়ি যাওয়া যাক।

ট্রাম নয়, বেবি-ট্যাক্সি ডেকে তাতেই উঠে বসল মহীতোষ আমাকে নিয়ে। সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটবার নির্দেশ দিয়ে সীটে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলল, তোর ঠিকানা কী?

বললাম।

—অফিস?

বললাম।

—অফিসের ফোন-নাম্বার?

তাও বললাম। আমার সব-কিছু একটা নোট বইয়ে টুকে নিয়ে বলল, প্রায়ই তোকে দরকার হবে ভাই, জানিস তো আমার আর কোন বন্ধু নেই। আত্মীয়-স্বজন সবাই ত্যাগ করেছে আমাকে। এমন কি আমার মা-বাবাও আমার কাছে আসেন না।

—কী রকম?

—তাঁদের সবার অমতে সুধাকে বিয়ে করেছিলাম, তাই। তা ছাড়া সুধারও দোষ আছে। কারু সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা ওর নেই।

—বল কী?

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা আমি ভেবেছিলাম তা ও নয়। আমার লাইফটা মিজারেবল হয়ে গেছে।

সুধা আমাকে দেখে খুব যে অবাক হয়েছে এমন মনে হল না। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে শুধু বলল, এস।

একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে চেহারাটা, মুখখানা একটু শীর্ণ, কিন্তু তবু যেন কেন বলতে ইচ্ছা করছে, সুন্দরতর হয়েছে ও। সমস্ত অবয়বে একটা তীক্ষ্নতা জেগেছে যেন, একটা সূক্ষ্মতার ইঙ্গিত। সাদা একটা ধবধবে শাড়ি ছিল পরনে, ব্লাউজটাও সাদা, এমব্রয়ডারি করে ছোট ছোট

একরঙা খয়েরী পাপড়ির ফুল তোলা, চোখে একটা সরু ফ্রেমের চশমা সোনার কিম্বা রোলগোল্ডের। মহীতোষ বললে, তোমরা বসে কথা কও। আমি ধরাচুড়ো ছেড়ে আসছি! শুনছ গো, অনিমেষ আজ এখানে খাবে কিন্তু। মহীতোষ চলে যাবার পর একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খাবে নাকি? এখানে?

—যদি খাওয়াও।

—তা বাড়ির কর্তা নিজে যখন বলেছে তখন না খাইয়ে উপায় আছে গিন্নীর!

—গিন্নী নিজে বুঝি নিমন্ত্রণ করত না?

—চার বছর পরে হঠাৎ যে দেখা দিল, তাকে নিমন্ত্রণ করার গরজ আমার নেই। কিন্তু সে যাক, ভাল আছ তো!

—আছি।

—বিয়ে করেছ তো?

—না।

মুহূর্তে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এমন একটা কিছু আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

যে কথাটা এতক্ষণ মনের মধ্যে গুম্‌রে মরছিল, অধৈর্য হয়ে সেই কথাটাই বলে ফেললাম এবং শেষ পর্যন্ত ওকেই বলে ফেললাম—মহীতোষ আর ছবি আঁকে না?

সহজ স্বরেই উত্তর দিলে, বললে, না।

—কেন!

অদ্ভুতভাবে একটু হেসে বললে, আঁকবার মত ভাল মডেল পায় না বলে।

—কেন, তুমি!

আবার তেমনি হেসে উঠল, বলল আমার ছবি তো এঁকে এঁকে হয়রান হয়ে গেছে, আর কত আঁকবে। আমার ঘরে চল, দেখবে, দেয়ালভর্তি সব আমার ছবি, সেই ঘাটশিলা থাকতে আঁকা।

—কলকাতা এসে বুঝি আর আঁকে নি?

—পাগল। এখানে ওর সময় কই? আচ্ছা, তুমি বোস, আমি রান্নাঘরটা ঘুরে আসি।

মহীতোষ এসে বসল স্থির হয়ে, বলল, কী? দেখলে?

—দেখলাম।

মহীতোষ নিম্নকণ্ঠে বলতে লাগল, কী না করেছি ওর জন্যে! দেখছিস তো ফ্ল্যাটটা। দেড়শো টাকা মাসে ভাড়া দেই। এই ফার্নিচার-গুলো কিনতেই কি কম টাকা লেগেছে? নিউ আলিপুরে জমিও কিনে রেখেছি কিছু, বাড়ি করারও ইচ্ছে আছে। আমাদের লাকিলি কোনো ইস্যু নেই, কেমন দুটি প্রাণীর হেসে-খেলে কেটে যাবার কথা, নয়?

—বটেই তো।

—কিন্তু জানিস, কী হয়েছে? শি ডাজন্‌ট লাভ মি।

প্রথমটায় একটু অবাকই হলাম, তারপর বললাম, দূর। বাজে কথা।

—বাজে কথা নয়। আমাকে ভালবাসে না। ওর পিছনে ঘুরতে গিয়ে আমার ক্ষতি হচ্ছে কী কম? সেদিন দুপুরে ওকে ফলো করতে গিয়ে প্র্যাক্‌টিক্যালি আমার একটা পার্টি হাত-ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড়। এ আমি কাঁহাতক পারি, বল তো ভাই। টাকা আনছি তবে কার জন্যে? তোমারই জন্য। তোমার শাড়ি, তোমারই গয়না। তুমি যাতে ভাল থাক, সুখে থাক—দ্যাট্‌স্‌ অল্‌ মাই এন্‌ডেভার।

বললাম, ব্যাপারটা কী, খুলে বল তো মহীতোষ। মহীতোষ একটুক্ষণ গুম্‌ হয়ে থেকে তারপরে বললে, শি হ্যাজ গট্‌ এ লাভার।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, বলছ কী! আমাদের সুধা!

হ্যাঁ ভাই, সুধা। লোকটাকে এখনও ধরতে পারি নি! কিন্তু এটুকু জানি ওরা গোপনে কোথাও গিয়ে মীট করে।

একটা অস্বাভাবিক [illegible] মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল কয়েকটা

মুহূর্ত। মনের মধ্যে এই কথাটাই গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল, সুখী হয় নি সুধা!

মহীতোষ বলল, তেমনি নিচু গলায়, রোজই, মানে প্রায়ই, ও দুপুরে একা বেরিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন হল আমি টের পেয়েছি ফলোও করছি, কিন্তু ধরতে পারছি না।

বললাম, কণ্ঠস্বর নিজেরই কানে কেমন যেন ভাঙা ভাঙা ঠেকল, ওকে জিজ্ঞাসা কর নি?

—করেছিলাম, মহীতোষ বললে, একদিন আফিস থেকে আন্দাজ করে দুপুরের দিকে ফিরতেই দেখি তখন ও বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশ কড়া গলাতেই বলেছিলাম, কোথায় যাচ্ছ? তা উত্তরে এমন করে আমার দিকে তাকাল যে বলার নয়। তারপরে বললে, কৈফিয়ত যদি না দেই। বলেছিলাম, না দাও না দেবে, কিন্তু আমি যদি কিছু করি তো তখন কৈফিয়ত চাইতে এস না যেন!—কিন্তু কী করি? কী করলে ওকে চরম আঘাত দেওয়া যায়? ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগলাম। ও কিন্তু নির্বিকার, ঠিক তেমনি দুপুরে বেরিয়ে যায়। আমি যে ফলো করেছি, তা-ও টের পেয়েছে, তবু কিছু বলে নি, বা যাওয়া বন্ধ করে নি। কিন্তু ভাই, ওর ক্লেভারনেস দেখে আমিই অবাক হয়ে গেছি লোকটাকে যে চিনি না, নইলে ঠিক ধরে ফেলতাম এতদিনে। চাকর-বাকরদের কিম্বা অফিসের কাউকে আমার হয়ে অনায়াসেই বলতে পারতাম ওর পিছুপিছু যেতে, কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারী বাড়ত, লোক জানাজানি হয়ে যেত, এই ভয়েই তেমন কিছু করি নি। এখন তোমাকে ভাই আমার হয়ে এ কাজটি করে দিতে হবে অনিমেষ। তুমিই পারবে। লোকটি আমাকে চেনে, কিন্তু তোমাকে চেনে না। তুমি শুধু লক্ষ্য রেখো, ও নিজে যাতে টের না পায়! এ উপকারটুকু তুমি করে দাও অনিমেষ। ভাবনায় ভাবনায় আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব! শান্তি নেই—একবিন্দু শান্তি নেই জীবনে!

একটু থেমে থেকে তারপরে বললাম, শুনেছি ছবি আঁকার মধ্যে শিল্পীরা শান্তি পায়। তুমি আঁক না কেন। যেন ওর সমস্ত শরীর

মন ধরে নাড়া দিয়েছে, এমনি বেপথুমান দেহভঙ্গির সঙ্গে বলে উঠল মহীতোষ, আঁকতে পারছি কই! কী আঁকব! আঁকার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। কোথায় গেল সেই ওর প্রাণচাঞ্চল্য। প্রথমে মেতে উঠল সংসার নিয়ে, তারপর এখন হয়েছে অন্য ব্যাপার। আঁকার উৎসাহটুকুও আর পাই না অনিমেষ! ও এইভাবে বাইরে যায়, আমি ভাবলাম আরও নতুন নতুন শাড়ি আর গয়না দিলে ও খুশী হবে, বাইরে আর যাবে না। নতুন নতুন সিনেমায় নিয়ে গেলে—। না, ওসব কিছুতে ওর রুচি নেই। যাতে আরও টাকা আসে এই ভেবে ব্যবসায়ে আরও মন দিলাম, কিন্তু ওর মন পেলাম না।

চুপ করল মহীতোষ, আমিও নীরব রইলাম কয়েক মুহূর্ত। নীরব, কিন্তু মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ঝিমঝিম করছিল সমানে। মাথাটা একটু টিপে ধরলাম। মনের মধ্যে তখনও একথা ঘুরছে—ও সুখী হয় নি, সুখী হয় নি ও।

সুখী হয় নি বলেই কি হাত বাড়িয়ে পেতে চেয়েছে কাউকে? অথবা এমন কাউকে সঙ্গী পেয়েছে, যে ওর হুহু-করা মনটাকে শান্ত করতে পেরেছে! সে কে তবে? কেমন তার চেহারা? কেমন করে সে কথা বলে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অন্য কথা এসে পড়ল মনে। বলে উঠলাম, কলকাতায় যে তুমি এলে, ও আপত্তি করে নি?

—মোটেই না। বরং বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি নরকেও যেতে পারি!

সুধা এক সময়ে এসে ঘরে ঢুকল লঘু পায়ে। বলল, হল তোমাদের গল্প? আমি দু দুবার এসে ঘুরে গেছি।

মহীতোষ উঠে দাঁড়াল, বলল, তোমরা কথা বল, আমি ওপর থেকে আসছি।

মহীতোষের দেহটা সিঁড়ির প্রান্তে অদৃশ্য হবার পর সুধা বললে, অনেকদিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা, গল্প করার ইচ্ছা তো হবেই। কী বল

—নিশ্চয়ই।

সুধা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললে, আমার মন বলত, একদিন-না-একদিন তুমি এ বাড়িতে আসবেই।

—খুশী হয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—মাঝে মাঝে এমনি আসব ?

—এস।

যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে সুধা, এমনি দূরাগত অস্ফুট কণ্ঠস্বরে ও বললে, কী কী খেতে ভালবাসতে মনে আছে, তাই করার চেষ্টা করছি। আমি নিজেই রাঁধছি। কী, প্রশংসা করবে না ?

একটু হেসে বললাম, খুব গিন্নীবান্নী হয়েছ দেখছি! রান্না-টান্না বুঝি নিজেই কর ?

—হ্যাঁ। রান্নার কাজ আমার খুব ভাল লাগে।

—মহীতোষ রাগ করে না ?

—করে। তবে অনুরাগও আছে।

বলে ফেললাম, খুব ভালবাস বুঝি মহীতোষকে ?

—খু-ব।

কথাটা শোনামাত্রই ওর মুখের দিকে তাকালাম ভাল করে। হঠাৎ মনে হল—সব ওর মিথ্যে কথা। বানানো কথা। হঠাৎই মনে হল মহীতোষের সন্দেহ অমূলক নয়, এ মেয়ের পক্ষে বুঝি সবই সম্ভব।

খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিতে এল মহীতোষ। এবারেও বেবী-ট্যাক্সী। বললে, কী বুঝলে অনিমেষ ?

বললাম—সুধা সত্যিই বদলে গেছে।

কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠে মহীতোষ বলে উঠল, ওর ভালবাসা আমি কেন হারালাম বলতে পার।

নিরুত্তরে চুপ করে রইলাম।

বললে, একটা পাথর নিয়ে সংসার করছি। শাড়ি দিলেও নির্বিকার

—গয়না দিলেও নির্বিকার—আঘাত করলেও নির্বিকার। ওঃ—হরিবল্‌!

মহীতোষ আবার বললে, লোকটাকে ধরতে পারলে বেঁচে যাই। ডাইভোর্স করতাম। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট হার। আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে নেই, মরে গেছে!

বেশ কিছুক্ষণ সময় নেবার পর অবশেষে বললাম, কোথায় যায় জান?

—জানি না আবার—মহীতোষ বলে উঠল, আলিপুরে যায়। জু-তে। সেটাই ওদের মিটিং প্লেস।

বললাম, আমি যাব।

কৃতজ্ঞতায় আমার হাত চেপে ধরে মহীতোষ বললে, বেঁচে যাই। আই মাস্ট নো দি ম্যান। কিচ্ছু করব না, কোনও হৈ-চৈ না, নিঃশব্দে আলাদা হয়ে যাব, ডাইভোর্স করব।

মহীতোষের সঙ্গে অতর্কিতে এইভাবে দেখা হয়ে গিয়ে ওর সাহচর্যে আমারও মনটা কেমন যেন বিহ্বল বিবশ হয়ে গিয়েছিল। নইলে সেদিন আলিপুরের জু-তে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম, তা তো ওখানে না গিয়ে ওর মুখোমুখি ওভাবে না দাঁড়িয়েও জানতে পারতাম। শুধু চিত্তের শান্তি এবং স্থৈর্য থাকলেই এটা হত।

ব্যাকুল ছুটি চোখ মেলে একভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে সুধা। বিহ্বল ছুটি চোখের দৃষ্টি! শিরীষ গাছের স্নিগ্ধ ছায়া ওকে ঘিরে আছে—মাথায় ঘোমটা নেই, খোলা চুলে বাতাস এসে খেলা করছে—ওর কোন দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্থির জানি, আমাকে ও দেখতে পায় নি।

চোখের ছানি কাটবার পর চোখের বাঁধন খুলে দিলে যেমন নাকি সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে—নতুন হয়ে চোখে পড়ে—তেমনি ওকে যেন আমি নতুন এক রূপে দেখতে পেলাম! মুহূর্তে স্বচ্ছ হয়ে গেল সব কিছু! কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আরে, সুধা না?

চমকে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে নি অনেকক্ষণ, তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলেছিল, তুমি!

—হ্যাঁ। একা-একাই এসেছ বুঝি।

—একাই তো আসি।

তখনও ওর দৃষ্টি একদিকে আবদ্ধ, সেইদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার মনে একটা কথা জেগে উঠল! আজ ভাবতে গেলে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন নির্লজ্জের মতই ভেবেছিলাম, মহীতোষকে গিয়ে চমকে দিলে কেমন হয়? যদি গিয়ে বলি, জু-তে যার সঙ্গে দেখা করতে সুধা আসত, সে আর কেউই নয়, আমি! কর এবার ডাইভোর্স, সুধাকে নিয়ে আমি—

কিন্তু সে-ছিল আমার মুহূর্তের চিন্তা। আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জু-তে সেদিন সুধা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিল, বড় কষ্ট, জান অনিমেষদা।

ওর মুখের সেই প্রথম 'অনিমেষদা' সম্বোধন জীবনে কখনও ভুলবার নয়। লোহার রেলিংয়ে রাখা আমার হাতখানার ওপর ওর হাতখানা ছুঁইয়ে রেখে বললে, জলের রেখা দেখতে পাচ্ছ? ধারাগিরি যাবার পথের সেই ঝরনার মত, নয়?—জলের ওধারের ওই বড় বড় গাছ-গুলো? সেই বনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, না? আমি ওই হরিণ-গুলোকে দেখতে আসি—না এসে পারি না—ওদের ওই যে অবাক হয়ে তাকানো। ওই হরিণ-চোখের মধ্যে আমার সব আছে জান? কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেইসব দিন! কেন ওরা ফিরে আসে না!

স্তব্ধ হয়ে ছিলাম বহুক্ষণ ওর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তারপর হঠাৎ-ই মনে হল, পিছনে-পিছনে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে নি তো মহীতোষ?—না। তা আসে নি। এই একটা জায়গায় তার ভুল হয় নি।

একটি ধানের শীষ

হৈমন্তী শিশিরবিন্দু পড়েছে একটি ধানের শীষের ওপরে। এত বড় আশ্চর্য ঘটনা কী কোনদিন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে সুকুমার? বিশালকায় আমগাছটার গোড়ায় বাঁধানো বেদী, তারপরেই উধাও ধানক্ষেত! মাঝে, কোন একটা আলিপথের ওপরে ঝুরি-ফেলা প্রকাণ্ড একটা বটগাছ থমকে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে। আরও দূরে দৃষ্টি ফেললে আম-নারিকেল-বেণুবন-মিশ্রিত একটা সবুজ বনরেখা চোখে পড়ে, তার আড়ালে ভিন্ন কোন গ্রাম।

সুষমা কিন্তু ব্যাপারটা প্রথম থেকেই ভাল মনে নিতে পারে নি। অনিল যখন তাকে ডেকে চিঠিটা পড়ে শোনাল, তখন কয়েক মুহূর্ত সে অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কথা বলতে পারে নি। অল্প একটু হেসে অনিল বলেছিল, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন! আজকেই সে আসছে। দশটার মধ্যে বেরুব, সেই বহরমপুর থেকে তাকে নিয়ে আসতে হবে তো?

বহরমপুর শহর থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে এই গ্রাম। সুষমার মুখের কথা ফুটল এতক্ষণে—সত্যি বলছ! সে আসছে এখানে! কিন্তু, কেন?

—এমনি। বেড়াতে। দুদিন কি তিনদিন থাকবে লিখেছে। আমি আরও কিছুদিন ধরে রাখতে চেষ্টা করব। নতুন জায়গায় আসছে, কখনও তো আসে নি আগে, একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখুক সব।

—আহা! সুষমা বললে—বেড়ানর যেন অভাব তার! সর্বক্ষণই তো হিল্লি-দিল্লি করে শুনেছি! একা মানুষ, টাকারও তো অভাব নেই! কিন্তু, হঠাৎ এখানে আসার শখ হল কেন তাই ভাবছি।

অনিল আবার একটু হাসল, বলল, আসতে কী চায়! আমিই চিঠির পর চিঠি লিখে—

—তাই বল!—সুষমার কাছে এতক্ষণে সমাধান হয় রহস্যের, বললে, তুমিই আনাচ্ছ তাকে চিঠি লিখে। কিন্তু তোমার চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি! আমি বাধা দিতাম?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে অনিল বলেছিল, না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মানে, বোঝই তো, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি আমরা—

গম্ভীর, দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সুষমা বলেছিল, সত্যি কথা। বাধাই দিতাম।

—কেন?

সুষমা উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, তাকে এখানে আনার পিছনে কত নিষ্ঠুরতা যে প্রকাশ পায়, সেটা ভেবে দেখেছ?

—নিষ্ঠুরতা! একটু অবাকই হয়েছিল অনিল, নিষ্ঠুরতা হবে কেন, বরং—

কিন্তু সুষমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা সে শেষ করতে পারে নি। ছলছল দুটি চোখ সুষমার। মুখখানা নিচু করে সে বোধ হয় রান্নাঘরের দিকেই যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডেকে উঠেছিল অনিল—যাচ্ছ কোথায়? এসেই যখন পড়ছে সুকুমার, তখন একটা ঘরের ব্যবস্থা—মানে, কোন্ ঘরটা ওর জন্য ঠিক করে দেই বল তো?

—তোমার বাড়িতে ঘরেরও অভাব নেই, লোকেরও অভাব নেই। যেটা হোক ঠিক করে দাও। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। খোকা ঘুমুচ্ছে, ঝিরি-ঝিকে ওর কাছে ডেকে দিয়ে আমি রান্নার তদারকিতে চললাম।

স্বামী-স্ত্রী, ছ-মাসের ছোট্ট শিশু—ছোট্ট সংসার, কিন্তু আয়োজন প্রচুর। অনেক জমি, অনেক গাছপালা, অনেক পুকুর, অনেক ক্ষেত, অনেকগুলি ঘর নিয়ে একতলা বাড়ি, ঝি-রাঁধুনী-চাকর-অফিসের লোকজন-গোয়ালঘর-হাল- বলদ-ট্রাক্টর- মোটরলরী- স্টেশন-ওয়াগন—এলাহী কাণ্ড! সুকুমার দেখে দেখে বিস্মিতই হয়ে গেল, বললে, ইউরোপ ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত গ্রামেই বাস করছ শুনে খুশী হই নি, কিন্তু, এসে যা দেখছি—এ তো চমৎকার!

অনিল বললে, সবই পিতৃদত্ত। আমি একটু আধুনিকতার প্রলেপ দিয়েছি এইমাত্র। বাইরের মহলে অফিস বসিয়েছি। তেমন কিছু

নয়, বিদেশে গিয়েছিলাম কৃষিবিদ্যা শিখতে, দেশে এসে কাজে লাগাচ্ছি সে বিদ্যেটা। কিন্তু তোমার খবর কী? ঘুরে ঘুরেই কাটাবে?

হেসে উঠল সুকুমার, বললে, তা কাটাব। কিন্তু, অনিল, তোমার আর সব?

—বাবা গত হয়েছেন, সে তো জানই।

—শুনেছিলাম। মা?

—কাশীতে থাকেন?

—তোমার দিদিরা?

—শ্বশুরবাড়িতে। মাঝে মাঝে আসে।

—যতদূর মনে পড়ে, তোমার ছোটভাইবোন তো কেউ ছিল না।

—না। আমিই ছোট। দুই দিদি আর আমি। তিন ভাইবোন। বল নতুন করে আর কী পরিচয় নেবে? সবই ভুলে গেছ দেখছি।

একটু অপ্রতিভের মত হাসল সুকুমার, না না, কিছুই ভুলি নি—

—ভুলেছিস। মাত্র চার বছরের অদর্শন আমাদের, এর মধ্যে সবই তুই—

বাধা দিয়ে বলে উঠল সুকুমার—না রে না, ভুলি নি। বউদি কোথায়? আর বাচ্চুটা? কী নাম রাখলি?

ভোরবেলায় উঠে সুকুমার যায় বেড়াতে, ওদের বাগানটাতেই যায়। বসে গিয়ে সেই শানবাঁধানো আমগাছটার বেদীর ওপরে। সামনে হেমন্তর ফসলভরা ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাসের হিল্লোল বয়ে যায়। কিন্তু আর থাকা হবে না এখানে। মাত্র খেয়ালের মাথায় চলে আসা। নইলে এবার রামেশ্বরম হয়ে একেবারে সিংহল ঘুরে আসার অভিলাষ আছে।

বাচ্চার ঘুম ভাঙে সবার আগে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে থাকে, একসময় উপুড় হয়ে যায়, 'য'-'য' করে কী যেন বলতেও চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ 'য' ছাড়া কিছুই ফোটে না মুখে।

ওঠে সুষমা। অনিলও উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। তার অফিসের নিয়ম অদ্ভুত। ছটা থেকে বারোটা। শীত-গ্রীষ্ম-বারোমাস।

কাজের চাপ বাড়লে, বিকেলে পাঁচটা থেকে একঘণ্টা কি দু ঘণ্টার জন্য কোন কোন কর্মচারীকে আসতে হয় ওভারটাইম খাটবার জন্য। অনিলের মতে, ট্রপিক্যাল দেশে মানুষকে দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে হলে সকালবেলায় কাজকর্ম করাই প্রশস্ত।

সুষমা বললে, শুনছ?

—কী?

—তোমার বন্ধুর বিমর্ষ ভাবটা লক্ষ্য করেছ? বলেছিলাম না? মানুষ কি কখনও ভুলতে পারে? পারে না।

—তোমার খালি ঐ চিন্তা! আমি অফিসে বসলাম। ও ফিরে এলে ডেকে পাঠিয়ে। চা খাওয়া যাবে।

বারবার কিন্তু নিজেই আনমনা হয়ে যাচ্ছে সুষমা। বাচ্চাটা খেলতে খেলতে অয়েলক্লথের ওপর পিছলে খাট থেকে নেমে যাচ্ছে, তাকে যথাসময়ে টেনে ওঠাতেও বুঝি দেরি হয়ে যায় সুষমার!

চারবছর আগে কলকাতায় দুই বন্ধুই তাদের বাড়ি আসত। বাবার সঙ্গে আলাপের সূত্র ছিল ওঁর, সেই সূত্র ধরে ক্রমে ক্রমে সুকুমারও আসতে লাগল। সুষমা তখন আশুতোষে, ফার্স্ট ইয়ারে। সুমনাও তাই। পিঠোপিঠি দু বোন, মাত্র একবছরের ছোট-বড়। একই 'বিষয়' নিয়ে একই 'সেকশনে' একই ক্লাসে পড়ে তারা। যমজ নয়, কিন্তু বহুলোকে যমজ বলে ভুল করত তাদের। প্রায় একই রকম নাকি দেখতে ছিল তারা। একই ধরনের শাড়ি আর ব্লাউজ পরে দু বোনে কলেজে আসত হেঁটে। বেশী দূরে নয় বাড়ি থেকে কলেজ, সুতরাং ট্রাম-বাসের হাঙ্গামা করতে হত না। দুজনে একদিন হেঁটে আসছে, সুমনা হঠাৎ একসময় কী মনে করে যেন ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, এই দিদি, জানিস?

—কী?

সুমনা বললে, কাল না, আমি নিচের ঘরে বসে পড়ছি তো! অনিলদা এল। পিছন ফিরে বসে আছি টেবিলে, মুখ দেখতে পায় নি। আমাকে 'সুষমা' বলে ভুল করে—

স্থান কাল ভুলে হি হি করে হেসেই উঠল সে।

চাপাস্বরে ত্রস্তে বলে উঠল সুষমা, রাস্তার মধ্যে হাসছিস কী অমন করে! অসভ্য!

কোনক্রমে হাসির উচ্ছ্বাসটাকে থামিয়ে দিয়ে মুখ লাল করে সুমনা বললে, তোমার ইয়েকে অমন ভুল করতে বারণ করে দিয়ো কিন্তু।

—আহা, কথার কী ছিরি!

সুষমা রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সেদিনই কলেজ থেকে ফেরার পথে। গলির নির্জনতায়। সুমনা বললে, রাগ করলি দিদি?

—না।

—ওই দিদি!—সুমনা একদিন আচমকা ওকে বলে বসল, ধর্, অনিলদা যদি আমাকে বিয়ে করে, আর সুকুমারদা তোকে—

সুষমা তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তোর বুঝি মনে-মনে এই ইচ্ছে।

—আমি!—নাটকীয় ভঙ্গিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুমনা বলেছিল—Any port in the storm!

ওর ভাব-ভঙ্গিতে সুষমাও হেসে ফেলেছিল অবশেষে, বললে, storm নাকি?

—নয়!—চোখে মুখে অদ্ভুত একটা ভাব এনে দুষ্টুটা বলেছিল, মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়। পদাবলী আওড়াব?

—জ্যেঠা মেয়ে!

আরেকদিন। পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে। রাত প্রায় এগারটা। কী যেন একটা বই পড়ছিল সুষমা তন্ময় হয়ে। হঠাৎ চমকে উঠল সুমনার গলার স্বরে।—হ্যাঁরে দিদি, "The hand that rocks the cradle, rules the world" মানে কী রে?

—ঘুমুস নি?

মাথা-ঝাঁকি দিয়ে সুমনা বললে, না। বল্ না মানেটা! তুই তো ভাল ছাত্রী, রাতদিন বই মুখে করে আছিস! সাধে কি আর অনিলদা তোকে—

—কের্!

মাথাটা বালিসের ওপর রেখে ক্লান্ত কণ্ঠে সুমনা বললে, সত্যি দিদি, এই খানে তফাত। বেশীক্ষণ বই নিয়ে থাকলে আমার কেমন যেন মাথা ধরে ওঠে! পড়াশুনা আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে আমি বরং—

বলে, কথাটাকে শেষ না করে, আপন মনেই মুখে আঁচলচাপা দিয়ে হেসে উঠল।

বইটা মুড়ে রেখে এবার সুষমাই প্রশ্ন করে, অনিলদাকে বুঝি তোর খুব পছন্দ?

—খু-ব। অমন ছেলে হয় না। স্মার্ট।

—আর, সুকুমারদা।

—ও? ও তো একটা ড্রিমার। খালি স্বপ্ন দেখে।

—কিন্তু, ভেবে দেখ্, বড়লোক। অনেক টাকার মালিক।

—তা হোক। টাকা ধুয়ে জল খাব নাকি?

মনে-মনে একটু হেসে সুষমা বললে, দেখ্ সুমি, স্বপ্ন দেখতে পারে কজন? আমার কিন্তু বেশ লাগে ওকে। সুপুরুষ।

মাথাটা তুলে এবার প্রায় উঠেই বসে সুমনা, বলে নিবি তুই?

—ধেৎ!

—সত্যি। আমার ভাল লাগে অনিলদাকে। কেমন উদ্যমশীল পুরুষ, কাজের মানুষ, কাজ না করে থাকতে পারে না। দেখছি তো! সোস্যাল গ্যাদারিং অর্গানাইজ করা, বন্যাত্রাণে সাহায্যে যাওয়া, সবার পুরোভাগে আছে অনিলদা। স্কলার হিসাবেও ব্রিলিয়াণ্ট।

আরেকদিন। সুমনা বললে—হ্যাঁরে দিদি।

—কী?

—কাল পিক্‌নিক্ পার্টিতে অনিলদার সঙ্গে আমাকে অত মিশতে দিচ্ছিলি কেন, নিজে দূরে দূরে থেকে? ভয় করে না তোর? যদি আমি সত্যি কেড়ে নি!

—তা নে না।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সুমনা, তারপরে,

অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, আমি খুব ভালগার, না রে দিদি? যা তা বলি—

—দূর, তা কেন?

সুমনা হঠাৎ ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে একেবারে টুক করে চুমুই খেয়েছিল, বলেছিল, ভীষণ ভালবাসে তোকে অনিলদা। ভালবাসবারই মত মেয়ে তুই।

সুষমা নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে বসিয়ে দিয়েছিল নিজের সামনাসামনি, বলেছিল, তোর কাছে আমি? তোকে খুব—খুব —খুব ভালবাসে সুকুমারদা। বিশ্বাস কর্।

আরেকদিন।

—দিদি?

—কী রে?

—ঠিকই বলেছিস।

—কী?

সুমনা বললে, ভীষণ ভালবাসে। ওই সুকুমার।

—কাকে?

—আমাকে।

বলতে বলতে বালিসে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল সুমনা। কী একটা সন্দেহ করে ওর কাছে গিয়ে দুহাতে ওর মুখ তুলে ধরতেই—

—এ কী, কাঁদছিস!

সুমনা ধরাগলায় বলে উঠল, কেন ও আমাকে অত ভালবাসে।

উত্তর দেয় নি সুষমা। দিতে পারে নি।

—দিদি?

—কী?

—বিয়ে করতে চায়!

—বেশ ত।

—আমি রাজী হব না।

সুষমাই এবার অবাক হয়, কেন?

—না না।

তা-ই হয়। দুই বন্ধুরই বিয়ে ঠিক হয় দুই বোনের সঙ্গে। কিন্তু, বি-এ-র পর। ততদিনে অনিল ঘুরে আসবে ইউরোপ। সুকুমারেরও তেমনি ইচ্ছা। সে যাবে—হিমালয়ে। কাশ্মীরে। ঘুরতে। দেশ দেখতে।

সুমনা দিদির কাছে এসে ঠোঁট উল্‌টে বললে, অভিমান!

—ওর, না, তোর? বিয়েটা করে যা না ওর সঙ্গে, কাশ্মীর ঘুরে আয়।

—তীর্থ করতে!—সুমনা বললে, না। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে আমি পারব না।

—আমার কিন্তু বেশ লাগে!

বলেই সুষমা আর দাঁড়ায় নি, সরে গিয়েছিল অন্যদিকে।

আপন মনেই বলে উঠেছিল সুমনা, দিদিটা ভীষণ চাপা। কিছুই বোঝা যায় না।

তারপর? দুই বছর পরে ফিরে এসেছিল অনিল। বিয়েও করেছিল সুষমাকে। কেটে গেল আরও দুবছর। এই তার বাড়ি, এই ফার্ম, এই তার শিশু। কিন্তু সুকুমার? সে ফিরেছিল আরও আগে। কী যে হল, বেঁকে বসল সুমনা—বিয়েই করব না। পড়ব। পড়াশুনা নিয়ে থাকব।

মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সুকুমারের। দেখে মায়াও হয়েছিল। সুমনার ঘরে গিয়ে সেদিন বকেও ছিল তাকে। কিন্তু তাকে টলাবে কে? বাবা নিজে এসেও পারলেন না। মা-মরা মেয়ে তারা দুটি বোন, বাবার বড় আদরের। আদর করতেই জানেন তিনি, শাসন করতে জানেন না।

বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে সুষমা চেয়ারটা শূন্য, সুকুমার কখন উঠে চলে গেছে! তারপরে বোধ হয় একদিন এসেছিল। সুষমা বাড়ি ছিল না, মামাবাড়ি গিয়েছিল বুঝি বেড়াতে। কিন্তু সেই শেষ। আর

তার দেখা মেলে নি। এমন কি, ওদের বিয়েতেও সে আসে নি। নৈনীতাল থেকে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছে শুধু।

বিয়ে-থা করে নি, ঘুরে ঘুরেই সে বেড়াত। দূরে দূরে। কলকাতায় আসত না কখনও।

ছ-সাত-মাস আগে। খোকা তখন সুষমার পেটে। বাবা নিজে লিখেছিলেন চিঠি। 'সুমনা সবে উঠেছে কঠিন অসুখ থেকে। কঠিন হার্টের রোগ। ওকে তোমার ওখানে পাঠাচ্ছি। চেঞ্জ দরকার।'

অনিলের উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু ওকে দেখে চমকে উঠেছিল সুষমা।—এ কী চেহারা হয়েছে তোর!

—ভাল হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে কদিন থাকি।

—থাকবি বই কী। তোর জামাইবাবু—

বাধা দিয়ে অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল সুমনা—তা-ও ত বটে। অনিলদাকে জামাইবাবু বলতে হবে, না? বিয়ের সময় 'হ্যাঁ' 'হুঁ' করে সেরেছিলাম, এখন তো তা চলবে না।

হেসে ফেলেছিল অনিল—তেমনিই আছ দেখছি!

দিন কয়েক পরে। ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে সুমনা। অনিল তখন ভিতরে এসেছিল কী একটা কাজে। তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল সুমনা—দেখে এলাম কর্মীর রূপ। পুরুষের রূপ তার কর্মের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে, আমরা মেয়েরা সেটা দেখে তৃপ্তি পাই।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনিলের মুখ, বললে, তোমার ভাল লাগল!

—চমৎকার লাগল অনিলদা।—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল মেয়েটা—"The hand that rocks the cradle, rules the world" মানে কী রে দিদি?

অনিল হাসি চেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুষমা জিজ্ঞাসা করল—

—এম্-এ পড়া মেয়ে বি-এ পর্যন্ত পড়া-কে মানে জিজ্ঞাসা করছিস?

—রাগ করিস না দিদি। সুমনা তার পিঠের ওপর হাতটা রেখে বলে উঠল, এ সবই তোর অনুপ্রেরণা। তোর প্রেরণাতেই জামাইবাবু পরিপূর্ণ কর্মী হয়ে উঠতে পেরেছেন।

সুষমা হঠাৎ বলে উঠল, কিন্তু আরেকজন? তার খবর জানিস কিছু?

সুমনা শুধু বলল, না।

ঘটনাটা ঘটল অতি অকস্মাৎ। দুপুরবেলা থেকেই কেমন যেন আকাশটা মেঘে ঢাকা ছিল সেদিন। লালবাগ গিয়েছিল সুমনা অনিলের সঙ্গে বেড়াতে। ফিরে এসে বললে, খুব ঘুরেছি দিদি! সেই যে খুব সুন্দরী বেগম সিরাজের, যাকে সন্দেহের বশে ঘরের দরজায় দেয়াল গেঁথে মেরে ফেলেছিল সিরাজ, তার কবরটাও দেখে এসেছি। এখন হাঁপ লাগছে।

সেই রাত্রি থেকেই অবস্থা গেল খারাপের দিকে। ডাক্তার, ওষুধ-পত্রর সু-ব্যবস্থা তো হলই, জরুরী তার গেল কলকাতায়—বাবার কাছে।

বুকটা দুহাতে চেপে বারবার বলতে লাগল সুমনা, বুকের এই-খানটায় বড্ড যন্ত্রণা দিদি!

বোধ হয় পাগলের মত হয়ে গেল অনিল। ইনজেকশন-রত ডাক্তারকে ব্যাকুল হয়ে বারবার বলতে লাগল, ওকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। তারপরে সুষমার দিকে ফিরে বললে, বোধ হয় আমার জন্যই এমনটা হয়ে দাঁড়াল। কেন ওকে আমি লালবাগ দেখাতে নিয়ে গেলাম!

—শান্ত হও দেখি, তুমি অধীর হলে চলবে কেন।

এলেন বাবা। কিন্তু এত দুর্বল-হার্টের রোগিণীকে স্থানান্তর করা সম্ভব হল না। কলকাতা থেকে নামজাদা ডাক্তারই সঙ্গে করে এনে-ছিলেন বাবা, যে-ডাক্তার ওর চিকিৎসা করেছিলেন আগে। এক কথায়, চিকিৎসা বা যত্ন, কোনটাতেই কোন ত্রুটি ঘটে নি!

রোগভোগের তিনদিনের দিন—রাত্রে—চারদিক যখন নিষুতি—আচ্ছন্নভাব থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠল সুমনা, আস্তে আস্তে ডেকে উঠল, দিদি!

রাত তখন গভীর। অনিল সুষমাকে ডেকে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে

সবে শুয়েছে। বাবা বাইরের ঘেরা-বারান্দায়—ইজিচেয়ারে এতক্ষণে বোধ হয় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছেন। অন্য ঘরে ডাক্তার।

সুষমা উন্মুখ হয়ে ওর মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবি ?

মাথা নেড়ে সুমনা জানাল, হ্যাঁ।

—বল্।

ক্লিষ্ট কণ্ঠে সুমনা বললে, দিদি—দোষ কী আমার ?

—কিসের দোষ ?

—চলে গেল কেন সে ?

বুঝতে পারলে, কার কথা বলছে সুমনা। তার কথা মনে করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে সুষমা।

সুমনা বললে, আমার মনটাকে আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না দিদি।

—আর কথা বলিস না, তোর কষ্ট হচ্ছে।

বাধা দিয়ে বলে উঠল সুমনা—না না, কষ্ট না। তাকে অবহেলাই করতাম। ভাবতাম, আমাকে ভালবাসাটা তার একটা খেয়াল। বড়লোকের মনোবিলাস। আমাকে পেলেই সব সাধ তার মিটে যাবে। তাই প্রাণপণে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতাম!

—বুঝেছি রে। সুষমা বললে, মন গুমরে গুমরে থেকেই অসুখটা বাধিয়েছিস।

ম্লান হাসল সুমনা। বললে, ক্ষমা কর্ দিদি। ভাবুক ছেলেদের পছন্দ করতাম না। ভাল লাগত জামাইবাবুকে। চুপিচুপি চোরের মত এসেছিলাম এবার তোদের সংসারে। কী যে ভাল লাগল জামাইবাবুকে দেখে! মনে মনে হিংসাও হল তোর ওপর। লালবাগে আমিই তো জোর করে নিয়ে গেলাম জামাইবাবুকে।

—জানি। সব জানি। আর তুই কথা বলিস না।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে সুমনা, তবু থেমে থেমে কোনক্রমে বললে, লক্ষ্মীটি—দিদি আমার, বলতে দে, আর বোধহয় বলবার সময়টুকুও পাব না।

বলে, দিদির একখানা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে এসে বললে, কিন্তু লালবাগের সেই কবরগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎই মনে হল, এ কী ভুল করলাম আমি! আমার মন এ কী চাইছে আজ! বুঝতে পারি নি, জামাইবাবুকে মনে মনে যা দিয়েছি, তা শ্রদ্ধা, প্রেম নয়।

থেমে গেল।

—তোর কষ্ট হচ্ছে রে, থাক।

—না না, সুমনা টেনে টেনে বলতে লাগল, হঠাৎই বুঝলাম এ কথা। বুঝেই তার কথা মনের ওপর পাথরের মত চেপে বসল। মনে হল, আমার থেকে অনেক বড় সে। তাকে বুঝতে পারি নি। বুঝতে গিয়ে তার নাগালও পাই নি। একটা দিনের কথাই বেশী করে মনে পড়ল। এসে, চুপচাপ যেমন সে ঘরের একদিকে বসে থাকে, তেমনি বসে আছে। আমি ভিতরের ঘরে কত কী কাজ সারলাম, কত কী গানের সুর গুনগুন করলাম, তার কথা মনেও হয় নি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ও-ঘরে গিয়ে দেখি, তেমনি বসে আছে নিশ্চল হয়ে। পুরুষের এ দীনতায় বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম, লজ্জা করে না! কেন আসেন আপনি!—দিদি গো, কথা তো নয়, যেন চাবুক মেরেছিলাম ওর মুখে। বিবর্ণ-বিষণ্ণ মুখখানা একবার তুলে ধরল আমার দিকে, তারপরে সেই যে নিচু করলে মুখখানা, আর ওঠাল না। রাগের-মাথায় তারপরে কত কি বলেছিলাম মনে নেই—সে তেমনি নীরবেই উঠে, নীরবেই বেরিয়ে গেল। সেই যে গেল, আর এল না। আর দেখাও হল না তার সঙ্গে।

সুষমা বললে, এত যে ভালবাসিস তুই, সে তা জানে?

—জানবে কেমন করে! তাকে যে অপমান করেছি—তাকে যে তাড়িয়ে দিয়েছি—নিজের মনটাকেই কী ভাল করে জানতাম!—তাকে ধরে রাখতে পারি নি।

সুমনাকে ধরে রাখতে পারে নি ওরা। সমস্ত যত্ন আর চিকিৎসার বন্ধন ছিন্ন করে সত্যিই সে একদিন চলে গেল। শেষের দিকে বাকরোধ

হয়ে গিয়েছিল তার, নীরবে চোখ দিয়ে শুধু জলই পড়েছে, একবারও আর মুখ ফুটে বলতে পারে নি সুকুমারের কথা।

সুমনার সে রাত্রের কথা এক সুষমা ছাড়া কেউ জানে না। কাউকে বলেও নি সুষমা, বলতে পারেও নি, স্বামীকেও না। যে চলে গেল, তার কথার জের টেনে আর কী হবে? শুধু মৃত্যুর খবরটা জানিয়ে সুকুমারকে চিঠি দিয়েছিল অনিল। সেই সুকুমার আজ এতদিন পরে এখানে, এই বাড়িতে, যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সুমনা। এখানে এসে বারবার ওর মনে পড়বে সুমনার কথা, মনটা দুঃখের ভারে ভেঙে পড়বে। এখানে ওকে আসতে বলাটা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর নয় কী? তাই, তার এখানে আসবার ব্যাপারে সুষমার সায় ছিল না, একেবারেই না।

তা-ই হলো। সুমনারই মত খুব ভোরে ওঠে সুকুমার, সুমনারই মত সেই আমগাছটার গোড়ায় শানবাঁধানো বেদীর ওপর গিয়ে বসে থাকে রোজ। কমই কথা বলে। সুষমার সঙ্গে তো নয়-ই, অনিলের সঙ্গেও তেমন নয়।

—কবে যাবে?

সুষমার এই অভাবিত প্রশ্নে বিস্মিতই হল অনিল—বললে, কে?

—সুকুমার। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে অনিল, ছিঃ—কী বলছ তুমি! তোমার কষ্ট হয় না?

—হয় না!—সুষমা বললে, খুবই কষ্ট হত ওর ভাবভঙ্গি দেখে। বেচারী। একদিন বলেওছিলাম, যা হবার হয়ে গেছে, এবার বিয়ে-টিয়ে করলে হয় না? তা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, বললে, কী হবার হয়ে গেছে! —কথাটা এমন ভাবে বলে উঠল, আমি একটু অপ্রস্তুতই হলাম। বললাম, আমি সুমনার কথাই বলছি।—উত্তরে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে মুখ নিচু করে বললে, ভুল হচ্ছে, সুমনা কোনদিনই আমাকে ভালবাসে নি! বলেই আর দাঁড়াল না, সরে গেল কাছ থেকে।

মন দিয়েই সুষমার কথাগুলি শুনছিল অনিল, বললে—আমিও

চেপে ধরেছিলাম সেদিন। বলেছিলাম, এবার বিয়ে কর। তা একটু হেসেই চুপ করে গেল, আর কিছু বললে না।

—এভাবেই কাটবে?

—কাটুক!—অনিল তার অফিসের দিকে যাবার উদ্যোগ করে বললে,—ওর খেয়ালে বাধা দিয়ে লাভও হবে না। থাকুক এখানে যতদিন খুশি, কিছু বোল না যেন, যত্ন-আত্তি কোর।

—তুমিই তো করছ যা করবার। আমার বয়ে গেছে!

অনিল ফিরে ঘুরে দাঁড়াল ওর মুখোমুখি, বলল, অত রাগ কেন ওর ওপরে?

সুষমা বললে, তা সত্যি। আগে মায়া হত, এখন রাগ হচ্ছে।

—কেন?

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ অথচ চাপা-স্বরে বলে উঠল সুষমা, পুরুষমানুষের অত হা হুতাশ কেন? তা-ও যদি কিছু পেয়ে থাকত সুমনার কাছ থেকে!

—পায় নি?

—না না না!—আকস্মিক উত্তেজনার আবেগে যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সুষমা—সুমনা কোনদিন ওকে ভালবাসে নি। কোনদিন চায় নি ওকে স্বামিরূপে।

বলেই ফিরে এল নিজের খাটটার কাছে। বাজুটা ধরে মুখ লুকাল। অনিল লক্ষ্য করল না, কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেল নিজের কাজে। ধীরে ধীরে মুখ তুলল সুষমা। যে কথা সে তার স্বামীকে এখন বলল, সবাই জানে সে কথা। ভাগ্যহত ব্যর্থ প্রেমিক ওই সুকুমার। অনুকম্পা জাগে, স্নেহ জাগে, মায়াও হয়।

কিন্তু সত্যিই কী তাই? প্রেম কী ওর ব্যর্থ? একজনের হৃদয়ের সুগোপন প্রেমের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত নয় কী ও? আর ওর স্বামী, ওই অনিল? ওই কাজ-পাগল লোকটা তো সেদিক থেকে ভিখারী!

কথাটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত মনের কোণে জেগে উঠতেই নিজের মাথাটা দু হাতে চেপে ধরল সুষমা।

সেদিনও ভোরবেলা সামনের খেতের দিকে মুখ করে সেই বাঁধান বেদীটার ওপরে চুপচাপ বসে ছিল সুকুমার। উধাও ধানখেতের ওপরে বাতাসের হিল্লোল অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সুকুমারের ঠিক সামনেই, যেখান থেকে ধানখেত শুরু হয়েছে, সেখানে টলটলে একটু জল আয়নার মত স্থির হয়ে আছে, সেখানে বাতাস এসে পৌঁছে কোনও ঢেউ তুলতে পারে নি। শুধু দূর-দিগন্ত থেকে সূর্যোদয়ের রক্তিম বিভা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছোট-ছোট কয়েকটা সাদা-পাখার প্রজাপতি কোথা থেকে ছুটে এসে খেলা করছে সামনে। আর ওই যে ধানের শিষ! টলটলে স্থির-জলের ঠিক পাশেই একটি শিষ দলছাড়া হয়ে অন্যদিকে যেন মুখ ফিরিয়ে আছে অভিমানে। শিষটির মাথায় ঠিক একফোঁটা শিশির জমে আছে কোন বঞ্চিতার অশ্রুবিন্দুর মত—বাতাস তখনও টের পেয়ে মুছে দিতে পারে নি, মুক্তোর মত ঝলমল করছে প্রথম সূর্যের আলোর কোমল স্পর্শে! দেখে দেখে ফেরে না চোখ। কত দূর-দূরান্তর—দেশান্তরই তো ঘোরা হল—কিন্তু এত কাছে এত অপূর্ব ঐশ্বর্য তো কোনও দিন চোখে পড়ে নি তার।

—আসব?

চমকে উঠল সুকুমার। তারপর অবাক হয়ে তাকাল সুষমাকে দেখে। এমন করে এত কাছাকাছি কিন্তু কোন দিনই আসে নি সুষমা। বললে, একটা কথা বলতে এলাম।

—কী?

—সুমনাকে ভুলতে পারছ না বুঝতে পারছি। এখানে থাকলে পারবেও না।

সেই ধানের শিষের একবিন্দু শিশিরের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল সুকুমার, বললে, আজই যাব। তাকে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এসে নতুন করে মনে পড়ছে।

—এখানে সে শেষ নিশ্বাস ফেলে গেছে বলে?

—না এখানে সে বেঁচে আছে বলে।

—বেঁচে আছে!

—হ্যাঁ—অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এক সুরে বলে উঠল সুকুমার—নিজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ? দুই বোনের চেহারার মিলের কথা বলছি না, বলছি রুচির কথা। সে যা হতে চেয়েছিল, তুমি আজ হয়েছ তাই। তুমি যা হতে চেয়েছিলে, সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই। সে ঘর করত, তুমি পড়াশুনা করতে। তা না হয়ে সে পড়া ধরল, তুমি করলে ঘর। না না, অমন চমকে উঠো না। এই ক-বছর আমি মানুষের বিচিত্র মন নিয়ে ক্রমাগত ভেবেছি।—

আরও অনেক কথা। কিন্তু সব কথা কানে যায় নি সুষমার। তার মনে হচ্ছিল, সে বুঝি কাঁপছে, তার পায়ের তলার মাটিটুকুও বুঝি সরে যাচ্ছে। কোনক্রমে বলে উঠল—না না, তুমি ভুল করছ। সুমনার কথা আমি জানি। শেষ সময়ে সে যা বলে গেছে—থেমে গেল সুষমা।

সুকুমার ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল, বল, কী বলে গেছে? বল?

—না না—বলতে বলতে অকস্মাৎ ছুটে ওখান থেকে পালিয়ে এল সুষমা। সুমনার শেষ কথা সে কাউকে বলতে পারে নি, আজও পারল না। এত চেষ্টা করেও পারল না। পারলে কি তার কোনও পরাজয় ঘটত? কোথাও? কারও কাছে?

হঠাৎ এসেছিল, হঠাৎই চলে গেল সুকুমার। যাবার সময় শুধু বললে, অনিল, আমরা দু-জন আর ওরা দু-জন, আমরা চারজন ছিলাম পরস্পরের পরিপূরক। একজন নেই। আমিও দূরে যাচ্ছি। দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি না, সুখ নিয়েই যাচ্ছি। পুরস্কার পাওয়ার সুখ।

ট্রেন ছেড়ে দিল! ভোরবেলার দেখা সেই একটি ধানের শিষের ওপরে একটি শিশির বিন্দুর কথা কোন দিনই ভুলতে পারবে না সুকুমার। কিন্তু কার চোখের অশ্রু শিশির? সুমনার, না সুষমার?

কী দেখে, আর কী অনুভব করে যে এই প্রশ্ন জাগল সুকুমারের মনে, তা সে-ই জানে।

প্রেম

বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি শ্যামল দ্বীপের উপর চুপচাপ একা বসেছিল লোকটি। চার বছর হল কলকাতায় এসেছি, সুদূর বিদেশ থেকে এসেছি দেশে, দেখে-দেখে চোখ এখনও ক্লান্ত হয় নি, —পথে যেতে আসতে কত লোকই তো চোখে পড়ে, কত বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন চেহারার—বিভিন্ন পোশাকের লোক! এক-এক সময় মনে হয়, নানান দেশের নানান ধরনের লোককে একটা গণ্ডির মধ্যে রেখে আমরা 'বাঙালী' নাম দিয়েছি বটে, কিন্তু কে যে কোন্ বিচিত্র পথে, কোন্ বিচিত্র রক্তধারার মধ্য দিয়ে এসে এদেশের ভাষায় আজ কথা বলছে, এদেশের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে, তা কে জানে? এর সঙ্গে ওর মিল নেই। এর মুখ লম্বা, ওর মুখ গোল, এ ফরসা, ও কালো, ওর মাথার চুল বড় বড়, ওর কর্কশ, কোঁকড়ান। এর চোখ টানাটানা, ওর চোখ গোলাকার—ছোট্ট!

তিনদিক দিয়ে গর্জন তুলে ঘুরে-ঘুরে আসছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাস, বৈকালের অফিস-ফেরতা ক্লান্তমুখ যাত্রিদল বোঝাই করে—মাঝখানে ত্রিকোণাকার ছোট্ট এক-টুকরো শ্যামল মসৃণ ভূমিখণ্ড, তার ওপর বসে ছিল সে, একটা ছেঁড়া খাকীর হাফপ্যান্ট পরা মাত্র, গায়ে কোন জামা নেই। গায়ের রঙ হয়তো একদা ফরসা ছিল—রোদে পুড়ে-পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথার বড় বড় অবিন্যস্ত চুল অযত্নে আর ধুলোয় লালচে দেখাচ্ছে। মুখ-ভর্তি দাড়ি—তা-ও লালচে। ঘন কালো দুটি ভ্রূর নিচে দুটি অদ্ভুত চোখ—সামনে নিবিষ্ট দৃষ্টি, কত লোক, কত যান, কত কোলাহল, সব ছাড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি যেন কোনও এক উধাও অসীম স্মৃতি-সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে!

পথ হাঁটতে হাঁটতে কেন যে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লোকটির ওপরে, কেন যে অদূরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে শুরু করেছিলাম

লোকটাকে, কে জানে—ওকে দেখতে দেখতে আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল তাকে। এমনি-ই দীঘল চেহারা, এমনি আজানুলম্বিত দুটি বাহু, এমনি তামাটে দেহের বর্ণ, এমনি অবিন্যস্ত লালচে মাথার চুল আর দাড়ি, এমনি জলজ্বল করা স্বপ্নিল নক্ষত্রের মত দুটি চোখ। এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে, সেই সেখানে—বিষুবরেখার দক্ষিণে ৪°৩৫´ দক্ষিণ দ্রাঘিমারেখা এবং ৫৫°৪৬´ পূর্ব অক্ষরেখার সুনীল সমুদ্র-মেখলা-বেষ্টিত সুনির্জন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে—যা এক শো ছাপ্পান্ন ফিট উঁচু একটা টিলার মতন, মাত্র আধমাইল যার বিস্তার—অসংখ্য নারিকেলকুঞ্জে যেখানে চারিদিক থেকে এসে লাগে অবাধ অগাধ হু-হু হাওয়া।

এখানে একা—একেবারেই একা থাকে সে। চারখানা ছোট্ট ঘর-ওয়ালা একটা টালি-ছাওয়া পুরনো বাড়ি। বাড়ির বাইরে সব দেয়াল-গুলিই লতাপাতায় ঢেকে আছে, লাল টালির উপরে অসংখ্য সাপের মত নানান লতাপাতার কচি-কচি ডগাগুলি এসে মাথা নুইয়ে পড়েছে।

ঘরের সামনে খুব বড় একটা উঠোনের মত—ঝকঝকে-পরিষ্কার, একটা ঝরা পাতাও পড়ে থাকতে দেয় না সে। এই উঠোনটাই একটু এগিয়ে নেমে এসেছে ধাপে-ধাপে একেবারে নিস্তরঙ্গ একটা জলাশয়ের ধারে, অনেকটা জায়গা জুড়ে এখানে বালির রাশি—মাঝে মাঝে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু নারিকেল গাছ।

মরা নারিকেল গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে এখানেই চৌকো-মতন একটা বালুকাময় জায়গাকে দেয়ালের মত কঠিন করে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারিকেলের গুঁড়ি চিরে চিরে পাতলা কাঠের মত করে ঘর তৈরি হয়েছে ছোট ছোট, আমাদের গাঁ অঞ্চলে হাঁস-মুরগী যেমন ঘরে রাখে, তেমনি ঘর।

এই 'ঘর' আর ঘরের জীবগুলিকে নিয়েই ওর সংসার। ছোট থেকে বড় নানান আকারের চকচকে ধারাল দায়ের মত সব অস্ত্র, একটা প্রকাণ্ড ক্ষয়ে-আসা পাথরের গায়ে শান দিতে দিতে বীভৎস হাসিতে এক এক সময় ফেটে পড়ে লোকটা। বেড়ার ধারে কাকে যেমন লক্ষ্য করে বলতে থাকে, চোখ মিটমিটি করে চেয়ে আছিস কী! এবার তোর পালা। নির্ঘাত তোকে এবার কাটব।

যাকে বলা হল—দীর্ঘদিন এই মানুষটার সাহচর্যে থেকে সে বোধ হয় এর ধরন-ধারন একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করেছে। বালিতে শুয়ে-বসে থাকার ফলে সর্বাঙ্গে বালি লেগে ধূলি-ধূসরিত। অতিকায় শক্ত খোলের মধ্য থেকে চারটি পা বার করে পোষা কুকুর বা বিড়ালের মত বসেছিল খানিকটা বালি খুঁড়ে, বালির মধ্যে। ওর কথায় সরু মুখটা একটু-একটু করে বাইরে এনে, হলদে-আভা-যুক্ত দুই বিন্দু পোখরাজ মণির মত দুই চক্ষু একবার ওর দিকে ফিরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বালির ওপর সরু মাথাটা রাখল নামিয়ে।

ওইভাবে বালি খুঁড়ে বালির মধ্যেই পড়ে থাকে, ওর ঘর নেই। এই মানুষটিও যেমন লাল টালির ঘর থাকতেও তার ঘরে না থেকে ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া টেনে তার ওপরে পড়ে থাকে সারা দিনরাত ওই নারিকেল-কুঞ্জের ছায়ার নিচে, তেমনি এর নারিকেল-তক্তার ঘর থাকা সত্ত্বেও সারা দিনরাত পড়ে থাকে বাইরে—মানুষটির সঙ্গে তফাত এই—ঝড়বৃষ্টিতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় লাল টালির ঘরে, একে নিতে হয় না। ঝড়বৃষ্টি-রোদ-ঠাণ্ডা সব চলে যায় ওর দেহের ওই শক্ত খোলটার ওপর দিয়ে!

একটি আধটি দিন নয়, এক-এক করে দশ-দশটি বৎসর তাদের দুজনের এমনি করে কেটে গেছে।

হাতের চকচকে ধারাল দা-টা ফেলে দিয়ে হঠাৎই এক সময় উঠে দাঁড়াল লোকটি, বললে, এবার একটু একা-একা থাক্। আমি ঘুরে আসি একটু। সারা সকালটা তোর সঙ্গে এমনি ফষ্টিনষ্টি করলে আমার চলবে নাকি?

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়াল সে—দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে খাকী রঙের একটা হাফপ্যাণ্ট শুধু—আপন মনে শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে গেল ওপরে, নিজের বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে কোথা থেকে উড়ে দুটো পাতা আর পাখির বাসার খড়কুটো পড়েছিল, সেগুলি তুলে ফেলতে ফেলতে—অদূরের ঝাঁকড়া-মাথা নিষ্ফলা জামগাছটাতে আশ্রয়-নেওয়া, চিকচিক করা চড়ুইয়ের মত পাখিগুলির উদ্দেশে অশ্লীল

গালাগালি দিয়ে উঠল সে। তারপর একটা বাঁকা নারকেল গাছের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটি ধরে আরও ওপরে উঠে গেল।

ওপরে—একেবারে কূর্মপৃষ্ঠের মত জলের উপর মাথা তুলে ওঠা পাহাড়টার মাথায়। অতিকায় কূর্মপৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের মত এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে আধ-মাইল জুড়ে। যেদিকে দু চোখ যায়, জন নেই, যান নেই—শুধু নারিকেল গাছের মেলা, কিছু কিছু ঝাঁকড়া-মাথা জাম বা ওই জাতীয় গাছ।

পর্বত-চূড়ার এক যায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত একটা পাথর দাঁড়িয়ে আছে, মিশ-কালো নয়, গাঢ় খয়েরী রঙের, অন্ধকারে তাকালে মনে হয়, ঠিক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সরু লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের একটা পাথর। তারই ঠিক পাশে চৌ-কোনা একটা পাথর, তিন কি সাড়ে তিন ফিট হবে দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। আর আশ্চর্য, পাথরটা এমনভাবে রয়েছে যে, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে ওই কালো মসৃণ পাথরটার ওপরে, সেই আলো ঠিকরে পড়ে নিচে তার উঠোনটির একপাশে তার লাল টালির ঘরগুলির দাওয়ার ঠিক সামনে।

দাওয়ার সামনেকার সেই অদ্ভুত হলদে হলদে আলোর রেখা দেখে তার ঘুম ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় ওপরে, পাথরটার কাছে। আয়নার মত ঝিলমিল করতে থাকে পাথরটা, তখন ওকে জীবন্ত মনে হয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে প্রখর হতে থাকে সূর্যের আলো, পাথরের ঝিলমিলে ভাবটা কমতে কমতে এক সময়ে একেবারে মিলিয়ে যায়। তখন সেই লম্বা খাড়া পাথর আর এই চৌকো পাথরটা—দুটো মিলিয়ে মনে হয়, একটি মানুষ আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কার অভিশাপে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ের এই চূড়ায় বসে পশ্চিম দিগন্তে স্পষ্ট চোখে পড়ে—'তমালতালিবনরাজিনীলা', একটি রেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ভিক্টোরিয়া শহর এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে। আর পূর্ব দিগন্তে চোখে পড়ে শ্যামলী মেয়ের কপালে কালো একটা টিপের

মত 'ক্রিকেট দ্বীপ'—দুদিকেই লোকালয়। আর চোখে পড়ে শান্ত, প্রসন্ন দিনে অসংখ্য সাদা বিন্দুর মত পালতোলা মাছ-ধরা নৌকো! মানুষ! ওরা কি একবারও এসে ভিড়বে না এই ভূমিখণ্ডে।

ভিড়বে। প্রতিবারই ভিড়ে। মাসখানেক ধরে এই নিস্তব্ধভূমি হয়ে ওঠে কোলাহল মুখরিত। সেই একটি মাস লোকটি ভীরুর মত বাস করে ঘরের মধ্যে, ওর নিজের কাজও থাকে বন্ধ। লোকগুলি আসে নারকেল পাড়ার মরসুমে। এই ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়েছেন যে বড় মানুষ, তারই ভাড়া-করা শ্রমিক হিসাবে মানুষগুলি আসে। কেউ-কেউ ওকে টেনে বার করতে চায় ঘর থেকে সন্ধ্যার উৎসব-মুহূর্তে।

—এই, কী নাম তোমার?

—কোন দেশের লোক?

ও কোনও উত্তর দেয় না। প্রাণপণে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে ওই কূর্মকুলের মত! ওরা হাসে, ছেড়ে দিয়ে অবশেষে চলে যায়। ফিরে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নানান গালগল্প রটনা করে লোকটিকে নিয়ে। এমনি করে করে দশ-দশটি বছর।

কিন্তু বছরের আর বাকী দশ মাস! আসে বই কী লোক। জোহার, জোনাথান আর বিশ্ব। আর ছোট্ট স্টিম-লঞ্চটার জনকয়েক মাঝিমাল্লা। প্রকাণ্ড বার্জ-টাকে লঞ্চের পাশে বেঁধে নিয়ে আসে ওরা, সমুদ্রের যে খাড়িটি সরোবরের মত ভিতরে ঢুকে এসেছে, মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা পাথর থাকায় অশান্ত ঢেউগুলো তারই ওপরে গর্জে মরে, ভিতরে আসতে পারে না, সেই খাড়ি দিয়ে পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওরা। শুরু হয় হাঁক-ডাক। বার্জ থেকে দড়ি বেঁধে ওপরে তার সেই নারিকেল-কাঠের দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে তোলা হয় চতুষ্পদ জলজ প্রাণীগুলিকে। আকারে খুব বড় নয়। বড় বড় ঢিপির মত জড়ো করা হয় ওদের। দু-তিন দিনের মধ্যে একটি ধারালো খাঁড়া দিয়ে সব সে শেষ করে দেয়—মাংসগুলি আলাদা আর খোলগুলি আলাদা করে নিয়ে আবার ওরা ফিরে যায়। বিরাট ব্যবসা। এ-ও ইজারাদারকে একটা লভ্যাংশ দান করে। কিন্তু আর একটা যে ওদের

গোপন ব্যবসা আছে—সেটা ? অবশ্য খুব কমই দেখা দেয় সেই ঘটনা। বছর দশেকের মধ্যে গোটা দশেকের বেশী নয়! সবাইকে লুকিয়ে মোটা টাকার ব্যবসা নাকি। তখন ওই লাল টালির সর্বদক্ষিণের তালা-দেওয়া ঘরখানা কাজে লাগে। বাকী ঘরগুলিতে তো আসর জমায় জোনাথান-জোহাররা। সবাই সিসেলাস দ্বীপপুঞ্জের লোক, সবাই থাকে শহর ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু পরিচয় দেবার বেলায় বলে, আমি ইহুদী, আমি মিশরী, আমি ভারতীয়। কিন্তু সে নিজে কী ? ওরা ডাকে 'জো' বলে—কী তার সত্যিকারের নাম ? কোথা থেকে এসেছিল তার পূর্বপুরুষ, ইস্রায়েল, মিশর, না ভারত ?

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখতে পেয়েই তরতর করে নেমে এল সে। এসে গেছে লঞ্চ—অর্থাৎ জোনাথান, জোহার আর বিশ্ব, আর মাঝিমাল্লা। আর সেই বার্জ। বার্জ হচ্ছে মাল-বওয়া নৌকোর খোলের মত—লঞ্চ টেনে নিয়ে আসে। শুরু হয় দড়ি দিয়ে বেঁধে তোলা সেই প্রাণীগুলোকে।

কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ওর। লঞ্চের ভিতর থেকে প্রথমে এল বাক্স-বিছানা—যেমন আসে! তারপরেই আশ্চর্য—জোনাথান আর বিশ্বের পাহারায় একটি মেয়ে।

প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল জোহার, এই জো, হচ্ছে কী ? কাজ কর নিজের। কাজ চলতে থাকে। দড়ির ফাঁস বেঁধে ওদের শুধু ওঠানোই নয়, চকচকে ধারাল দা দিয়ে রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি বার করে আনতে হয়।

দু দিন পরেই বার্জ-বোঝাই মাংস আর খোল নিয়ে চলে গেল ওরা। জোনাথান বললে, মেয়েটাকে রেখে গেলাম। তিনদিন পরে ফিরব। সাবধান।

এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। বলে, ঠিক আছে।

এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডে একা একা কোথায় ঘুরবে মেয়ে ? কোথায় পালাবে ? একটি মেয়ে সেই বহু বছর আগে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। অতিকষ্টে যখন তাকে তোলা হয়, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সে তখন বিপর্যস্ত, জ্ঞানহারা।

জোনাথানের সাবধানতা এইখানে। নইলে সবাই জানে, গুমরে গুমরে শুধু কাঁদবে মেয়েগুলো, খেতেও চাইবে না, আর নয়তো উন্মত্তের মত এক এক সময় জো-কে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

মনে মনে হাসে জো। কে কাকে ছাড়বে? বেঁধেই বা রেখেছে কে কাকে? এই তো আধ-মাইল পরিধির ছোট্ট জগৎ, এর মধ্যে সে নিজে আছে দশ বছর। একটি দিন, একটি মুহূর্তের জন্যও বাইরে যায় নি, যেতে পারে নি।

এক-একদিন রুদ্ধ এক দুর্বার আক্রোশ জমে উঠত মনে। সেই যে প্রথম মেয়েটিকে এনেছিল ওরা, তার দিকে কেন যেন অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভাল করে তাকিয়েও দেখে নি সে, অবশ্য সেবারে জোনাথান ছিল এখানে —তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেছে তাদের এই জো-কে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মেয়েগুলির বেলায় জোনাথান আর থাকে নি, তারই উপর দিয়ে গিয়েছিল সব ভার, ওকে তারা সর্বরকমে বিশ্বাসও করেছিল বোধ হয়। বিশ্বাসভঙ্গ সে করে নি, অর্থাৎ সাহায্য সে করে নি মেয়েগুলিকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু বিশ্বাসের অর্থ যদি অন্য কিছু হয় তো সেখানে সে চরম আঘাত হেনেছিল ওই মেয়েগুলির বেলায়।

কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল মেয়েগুলি। এই ভূমিখণ্ডে পা দিয়েই ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, কী হবে ওদের অবস্থা! কেমন করে জোহার-জোনাথানদের খপ্পরে পড়ে মেয়েগুলি, কে জানে— লঞ্চে আসবার সময় কোনও চাঞ্চল্য নেই, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হয় কান্না আর কান্না।

ওরা তার পায়ে পড়ে যত কাঁদত অসহায়ের মত, তত পৈশাচিক দানবতায় উল্লসিত হয়ে উঠত ওর মন। সিসেলাস-এরই মেয়ে ওরা— কিন্তু জোনাথানদের হাতে পড়েছে, এরপর কোন্ দূর-দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ওদের স্থিতি হবে কে জানে, এই দু দিনের জন্য ওর আতিথ্যে আছে যখন, তখন সে-ই বা ছেড়ে দেবে কেন? নিরুদ্ধ বঞ্চিত যৌবন যেন ক্ষুধিত বিষাক্ত কোন সাপের মত ক্রুর হয়ে উঠত।

কিন্তু তারপর? পঞ্চম বৎসর থেকে শুরু হয়েছিল ওর ভাবান্তর। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম আর নবম মেয়েটির বেলায় তার কোন কৌতূহলই জাগে নি। টালি-ছাওয়া বাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা খুলে দিয়েছে, ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়েছে, ব্যস, ওই পর্যন্ত। চতুষ্পদ ও জলজ প্রাণীগুলির মতই কোন ভীরু প্রাণী যেন ওরা, কান্নাকাটি করেছে—চকচকে ধারাল ছুরি দিয়ে হৃৎপিণ্ড বার করে আনার মুহূর্তে লম্বা মুখখানা যন্ত্রণায় বার করে নিষ্প্রাণ পাথরের চোখের মত ওরা যেমন তাকায়—কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে ওঠবার মুহূর্তে ঠিক তেমনি চোখেই শেষবারের মত মেয়েগুলি তাকিয়ে গেছে তার দিকে।

সেই নারিকেল-তক্তা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। তেমনি বালি খুঁড়ে সর্বাঙ্গে বালি মেখে শুয়ে আছে অতিকায় প্রাণীটা। জো ধীরে ধীরে এসে বসে পড়ল তার অনতিদূরে, তারপর বললে, জানিস, ওরা চলে গেল। দশ-দশটা বছর ধরে এতগুলিকে একে একে শেষ করলাম, তোকে আর কিছু করতে পারলাম না।

ময়াল সাপের মাথার মত মাথাটা নুইয়ে রেখেছিল বালির ওপরে, ওর কথার উত্তরে মাথাটা একটু হেলাল, পোখরাজ মণির মত দুটি চোখ যেন নীরব হাসির আভায় মুহূর্তের জন্য উঠল ঝিলমিল করে।

আচ্ছা? প্রাণীটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল জো, সবারই জুড়ি থাকে, তোর কোন জুড়িও নেই রে?

মাথাটা সোজা করে চুপচাপ নিস্পৃহের মত পড়ে থাকে প্রাণীটা।

জো বলে, দশ বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন থেকেই তোকে দেখছি! জবুথবু বুড়ো। তাড়া করলাম, তুই পালাতে পারলি না। হত-ভাগা! তোকে সেদিনই কেটে ফেলতাম—ওই বিশ্ব এসে বাধা দিয়েছিল বলে তুই বেঁচে গেলি। বললে, এটা বুড়ো, একে মারিস না। ও আবার এসব জানে-টানে কি না, তোকে ভাল করে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে সেবারই বলেছিল, এটা পাথুরে বুড়ো, এক-শো-রও বেশী বয়েস। তা হ্যাঁরে, তোরা নাকি দেড়-শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকিস?

যাকে প্রশ্ন করা হল, সে নির্বিকার। একটা নারিকেল-খোলে কিছু জল নিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করতে বসল জো। ও একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে মুখটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, শুধু পোখরাজ মণির মত ছুটি চোখ আর মাথার অগ্রভাগটা রইল সামান্য একটু বেরিয়ে।

জো ওর গায়ের বালি পরিষ্কার করতে করতে বললে, ইশ! অমনি লজ্জায় মুখ লুকান হল! গা ধুইয়ে দিচ্ছি কি না! দেখ্, আমাকে ওরা জো বলে ডাকে, আমার নামধাম সব ওরা ভুলিয়ে দিয়েছে, আমি তোরও নাম ভোলাব, তোকেও ডাকব 'জো' বলে, বুঝেছিস?

এই শোন্? জো জো-কে ফিস্‌ফিস করে বলতে লাগল, এ মেয়েটা কাঁদে না রে?

আমাকে বললে, বেশ স্বাস্থ্য তো তোমার, কত বয়স হল?

আমি তো মনে মনে হেসে বাঁচি না?

বয়স? বয়স আবার কী? তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ, যা কিছু একটা ধরে নাও না। অবশ্য মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম তোর কাছে! ইশ! কী বালি মেখেছিস।

বলে জোরে জোরে ওর গা-টা ঘষতে থাকে ন্যাকড়া দিয়ে, চুপিচুপি বলে, তোকে রোজ কাটব বলি, তুই তো পালিয়েও যেতে পারিস সমুদ্রে। তোকে তো আর আমার মত এখানে কেউ লুকিয়ে রাখে নি! তোর মত অবস্থা হলে আমি ঠিক শহরে চলে যেতাম একটা নৌকো তৈরী করে নিয়ে। কিন্তু যাব কোথায়? জোনাথান বলেছে, দেখতে পেলেই নাকি আমাকে ধরবে। তাই আছি পড়ে, খাই-দাই আর আনন্দে ঘুরে বেড়াই।

আপন মনেই বিড়বিড় করে যাচ্ছিল জো, হঠাৎ একটা মেয়েলী চিৎকারে রীতিমত চমকে উঠল সে।

দেখে—সেই মেয়েটি। কাল-পরশুর মত গাউন পরা নয়, ভিক্টোরিয়ায় যে কয়েকঘর ভারতবাসী আছে, তাদের মেয়েদের মত শাড়ি পরেছে আজ, পাতলা হলদে-হলদে রঙের একটা শাড়ি। 'প্রাণী-জো'র দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে 'মানুষ জো'কে বলছে, ওটা কী?

জো তাকিয়ে ছিল ওর দিকে অবাক হয়ে, কোন কথা বলতে পারে নি।

মেয়েটি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে, বললে, বাব্বাঃ! কী প্রকাণ্ড কচ্ছপ! ওটা তোমাকে কামড়ে দেয় না।

এবারেও উত্তর দেয় না জো, অচেনা মানুষের সামনে সত্যিই তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে, সহজে কথা ফোটে না। জোরে জোরে সে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষতে থাকে জো-র শক্ত পিঠ। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, তারপরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় ছোট্ট ঘরগুলির দিকে, তক্তার ফাঁক দিয়ে বন্দী কূর্মকুলকে যতদূর লক্ষ্য করা যায় দেখে এসে বলতে থাকে—ওটার মত বড় তো একটাও নেই, ওগুলো সব ছোট-ছোট। জুড়ি নেই ওর?

জলদগম্ভীর স্বরে এবার বলে ওঠে জো—না।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে আসে সীমানার বাইরে, তারপরে তরতর করে উঠে আসে ওপরে, নিজের ঘরের উঠোনে। ভাঁড়ার খোলা রয়েছে—জোনাথানদের দেওয়া খাদ্য-ভাণ্ডার। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেয়েটি তার পিছনে পিছনে এসে বসে পড়েছিল উঠোনেই—তার খাটিয়াটার উপরে।

—ওই, শোন?

মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে ক্রমশই অবাক হচ্ছিল জো—উনোনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এল সে, তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, কী?

সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটি, বললে—কতদিন আছ এখানে?

গর্জন করে উঠল জো, বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি, চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না বয়স, গায়ের রঙ ঠিক কালোও নয়, ফরসাও নয়, মুখখানা সুন্দর, টিকলো নাক, টানাটানা চোখে কালো দুটি চোখের তারা, মাথায়

চুল বব্‌ করা নয়, লম্বা আর ঘন—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেশ সপ্রতিভ ঝকঝকে মুখের ভাব।

ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল নীরবে, তারপরেই আপন মনে বলে উঠল, কী লোক রে বাবা। কথা কইতে জানে না। খেঁকিয়েই আছে।

উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তার মুখে ঢাকা দিতে দিতে বোধ হয় কথাগুলি কানে গিয়েছিল জোর—একটা অদ্ভুত অসহিষ্ণুতা আর অব্যক্ত জ্বালায় মনটা ভরে থাকলেও এগিয়ে এসে কথা বলতে পারল না সে—তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে গেল নিচে।

ওর জো ততক্ষণে আবার কী করে যেন বালি মেখেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর কাছেই নারকেল তক্তায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল জো বালির ওপরে, বললে, কে রে মেয়েটা! কাঁদেও না! বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। খুলে বলব নাকি সব ?

ওর জো ততক্ষণে চারটি আঁশ-ওয়ালা পা ছড়িয়ে মুখটা নামিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, নিঃসাড়।

—কী রে, ঘুমুলি নাকি ? ওর দিকে তাকিয়ে জো বলে, তা ঘুমো। যতদিন মাংস জুটছে, কিছু বলছি না, মাংস ফুরলেই তোকে শেষ করব। তখন বুড়ো বলে মানব না।

—ও বুড়ো নাকি ?

চমকে মুখ তুলল জো। মেয়েটা আবার কখন চুপচাপ নেমে এসেছে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল জো, তেমনি তীব্র-কণ্ঠেই বললে, তাতে তোমার কী ?

—আমার আবার কী! মেয়েটি বললে, কিন্তু চলে এলে যে! আমি একা থাকব নাকি! কথা কইব কার সঙ্গে ? আচ্ছা লোক রেখে গেছে খবরদারি করতে!

—করব না খবরদারি!—বলে দুমদুম করে পা ফেলে উপরে উঠে এল জো। বলাবাহুল্য, পিছনে-পিছনে মেয়েটাও।

অব্যক্ত নিদারুণ একটা ক্রোধের জ্বালায় যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে

জো—একটা অদ্ভুত অস্বস্তি! এ কী ধরনের মেয়ে এল এখানে! তো ঘরে বসে কাঁদেও না, ভয়ে আড়ষ্ট হয়েও যায় না!

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল জো, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে বলে উঠল, জান না?

—কী!

জো উত্তেজিত—চাপা কণ্ঠে বললে, কেন তোমাকে আনা হয়েছে!

—কেন?

জো রুদ্ধনিঃশ্বাসে বললে, তিন দিন পরে ওরা ফিরে আসবে।

—জানি।

—জান?—জো বললে, কোথায় তোমায় নিয়ে যাবে, সেটা জান?

—জানি। বিশ্ব আমাকে বলেছে। ইণ্ডিয়ায়।

চিৎকার করে উঠল জো—চুলোয়! তোমাকে ওরা দূরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে!

তবুও যেন ভয় পেল না মেয়েটি, ঠোঁট উল্‌টে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, কে কাকে বেচে দেখা যাবে!

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জো।

—কী! দেখছ কী!—লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে, তা দেখ যত খুশী, কারণে-অকারণে অমন খেঁকিয়ে উঠো না বাপু।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড ক্রোধের বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল দেহে, মুখ বিকৃত করে উন্মত্ত পশুর মত হঠাৎই একটা বিকট চিৎকার করে উঠল জো, তারপর লাফ দিয়ে একটা জন্তুর মতই ছুটতে ছুটতে সে উঠে গেল আরও ওপরে, মানুষের পাথর হয়ে যাবার মত সেই যে লম্বা পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে, একেবারে দু হাতে তাকে বেষ্টন করে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিছুক্ষণ ধরে দম নেবার পর, তার মনে হল, তার পিছনে পিছনে এখানেও উঠে আসে নি তো মেয়েটা?...না, তা আসে নি, যে খাড়া চড়াই—সহজে উঠে আসা সম্ভবও নয়! কথাটা মনে হতেই কিছুটা

নিশ্চিন্ত বোধ করে জো, তারপরে সেই আয়নার মত চৌকো পাথরটার মাথায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, তবুও মিষ্টি-মিষ্টি লাগে। রোদ্দুর আর হু হু হাওয়ার মধ্যেও যেন ঘুম জড়ানো আদরের ছোঁয়া। নীল আকাশের ওপর দিয়ে সাদা-সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে এক সময় পাশ ফিরে দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়েই অতর্কিত বিস্ময়ে মুখ তোলে জো। কালো একটা রেখার মত ক্রমশ ঘন হল সেই রেখা। বাড়তে লাগল সেই কালিমা। সাদা পালতোলা নৌকোগুলো সব ফিরে গেছে। আসছে ঝড়—বুক দুরু-দুরু-করা ঝঞ্ঝার স্বেচ্ছাচার।

নিচে নামতে গিয়েও চট্ করে নামতে পারল না জো। কাকে গিয়ে আগে সামলাবে? মেয়েটাকে? না, সেই বালির ওপর হুমড়ি-খাওয়া বৃদ্ধ জীবটাকে? বলবে, ভয় নেই, আমি আছি। বহু ঝড় কেটে গেছে এই দশ বছরে, কোন ঝড়ই আমাকে টলাতে পারে নি, আজও পারবে না।

কিন্তু মেয়েটার ওপর সে অমন করে ক্ষেপে উঠল কেন হঠাৎ! কেন হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সে অমন করে! মেয়েটা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গেছে। মনে-মনে হাসল জো—ভয় পাইয়ে দেওয়াই ভাল। ভয় একটু পাক। এই নির্জন ভূমিখণ্ড, এরও একটা ভয়ঙ্করী রূপ আছে। আজ দশ বছর প্রতিটি রাত্রি সে তা অনুভব করেছে মর্মে-মর্মে! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—একা থাকা যে কী কঠিন এমনি করে, তা যে না থেকেছে, সে বুঝতেই পারবে না।

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে নেমে এল জো। তার খাটিয়ার ওপরে তেমনি করেই বসে আছে মেয়েটি। পায়ের শব্দে মুখ তুলল। তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে জো বললে, ঝড় আসছে, ঘরে যাও।

মেয়েটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়াটার আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে, যেটুকু আকাশ তার চোখে পড়ল তা নীল

—ঘন নীল কালো মেঘের কোনো ছোঁয়াও নেই। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তেমনি চোখেই তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

জো-র মনে হল, এমনি হতে পারে, প্রচণ্ড ভয়ে ভিতরে-ভিতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটি এবং সে বিহ্বলতা এত বেশী যে, কথাই ফুটছে না তার মুখে।

মুহূর্তের জন্য মমতায় স্নিগ্ধ হল মন, মেয়েটির কাছে এসে বললে, ভয় পেয়েছ, না ? আমি অমন চিৎকার করে উঠেছিলাম বলে ক্ষমা কর। দশ বছর আছি, কেমন যেন হয়ে গেছি। পাগলের মত।

মেয়েটি মুখ তুলে তেমনিই তাকিয়েছিল, বললে, একা একা আছ— সঙ্গী নেই, সাথী নেই মাথার গোলমাল তো একটু হতেই পারে।

—কী ! মুহূর্তে রুখে দাঁড়াল জো, সত্যি সত্যিই আমি পাগল !

মেয়েটি একটু হাসল, বলল, তোমার খুব কষ্ট, না ?

মনে হল, তার বুকে চকচকে ধারাল দা দিয়েই আঘাত করল কে যেন। ক্ষিপ্তের মত হাত-পা শক্ত করে আবার ইচ্ছা হল তেমনি চিৎকার করে ওঠে ! কিন্তু না, অতিকষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিল সে, তারপরে ছুটে চলে এল নিচে।

সেই বালিমাখা বৃদ্ধ জো। বললে, মেয়েটা আমাকে পাগল করবে রে ! এর চেয়ে ফাঁসির কাঠে লটকে মরাও ছিল ভাল।

বিড়বিড় করে আরও কী যেন সে বকে যাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে। কালো হয়ে গেছে আকাশটা, কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। আর হাওয়া !—মনে হল এখুনি উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে !

ছুটতে ছুটতে এল ওপরে। মেয়েটি উঠোন ছেড়ে নিজেই গেছে দক্ষিণের ঘরে। কপাটটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

শুধু ঝড় নয়, জলও। ঝর্‌ঝর্‌ ঝম্‌ঝম্‌ অশ্রান্ত বৃষ্টি। নিচে, বুড়ো জো-র ঘরটা খোলাই দেখে এসেছে, জো আস্তে আস্তে নিজেই চলে যাবে, ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা এই মেয়েটিকে নিয়ে। জল

নামবার আগেই মাংসের হাড়িটা ভিতরে নিয়ে এসেছিল জো, হয়েও গিয়েছিল রান্না। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্নান বোধ হয় ভোরেই সেরে নিয়েছে মেয়েটা। উঠোনের নিচে বিপরীত দিকে প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের বুকেই পুকুরের মত হয়ে আছে, বৃষ্টির জল-ধারা থাকে তাতে। সেই জল বালতিতে উঠিয়ে স্নান, সেই জল ফুটিয়েই খাওয়া।

কোনক্রমে নিজের ঘরের কপাট খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঘা দিল জো। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। মেয়েটি দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সে। কয়েকটা বাসন, বড় একটা বাটিতে মাংস, এই সব সে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে। বললে, খাবার।

মেয়েটা একটা লাল লাল ফুল-ছাপান ড্রেসিং গাউন পরেছে, বললে, তোমার ভাঁড়ার থেকে খাবার তো নিয়েই এসেছিলাম। এই দেখ, কত পাউরুটি, জ্যাম, জেলির শিশি। কুঁজো-ভর্তি জল তো রাখাই ছিল। আর তোমার রান্না ওই মাংস নিয়ে যাও। খাব না।

—কেন!

—কচ্ছপের মাংস আমি খাই না।

—কেন?

—বাবা রে বাবা, অত 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না।

জো বললে, ভাল মাংস। 'হক্স্‌বিল'-কচ্ছপের মাংস বিষ, সে মাংস আমি ফেলে দেই। এ হচ্ছে ভাল জাতের কাছিমের মাংস। খাবে না?

একটু হেসে মেয়েটি বললে, না। আমি হিন্দু, তা জান? ভারতবর্ষে গুজরাট বলে একটা দেশ আছে, আমি সেই দেশের মেয়ে—বৈষ্ণব। আমাদের ওসব খেতে নেই।

হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জো। ওর সব কথা সে বুঝতেই পারল না। মেয়েটি বললে, বোস না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি?

বলতে-না-বলতে—কী আশ্চর্য, মেয়েটি একেবারে ধরে ফেললে ওর হাত, একেবারে ডানহাতটা, যেটা দিয়ে ও কচ্ছপের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি

বার করে আনে। তারপরে বসিয়ে দিলে চেয়ারের ওপরে। নিজে বসল তার খাটে—বিছানার উপরে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানলাগুলি সব বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই। কুলুঙ্গিতে জড়ো-করা অজস্র মোমবাতি, তার একটা জ্বালিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসল, বললে, ভাবছ, সিসেলাসের মেয়ে হয়ে আমি জানলাম কী করে? জেনেছি। আমারই এক পূর্বপুরুষকে জলদস্যুরা ধরে এনেছিল এই দ্বীপে। তিনি বিয়ে করেছিলেন দ্বীপেরই এক মেয়েকে। সেই বংশেরই আমি মেয়ে, বংশ-পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি আমরা কোথাকার। গুজরাট। বৈষ্ণব। হিংসে আমাদের করতে নেই!

—হিংসে!

—হ্যাঁ। মেয়েটি বলল, জীবজন্তু মারাটা আমাদের কাছে পাপ।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল জো, কিন্তু আমি তো গুজরাটের নই, আমার কাছে পাপ হবে কেন?

অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে মেয়েটি, বললে, কে বলেছে তোমার পাপ! আমি আমার কথা বলছি।

মোমবাতির স্বল্পালোকেই মনে হল, মেয়েটির দুটি চোখ যেন স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে যেন বলতে শুরু করল, ছোট থেকেই বাপ মাকে হারিয়েছি। বাবার লেখা ডায়রিখানা ছাড়া পিতৃ-সম্পত্তি কিছুই নেই। মানুষ হয়েছি এক কনভেন্টের অনাথ-আশ্রমে। তা-ও বড় হয়ে একবার দুষ্টুমি করেছিলাম বলে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী আর করি? লেখাপড়া তো হল না—হোটেলে নাচবার কাজ নিলাম।

—নাচ?

হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল মেয়েটি, খাটো পোশাক পরে নানা রকমের নাচ। তখন মাংস-টাংস সবই খেতাম। অমন চমকে উঠো না, চৈতন্য মানুষের একদিনেই আসে না। দিন যায়। একদিন বাক্স থেকে হঠাৎই বার করলাম বাবার লেখা ডায়রিটা। পড়ে মনে হল। করেছি কী আমি? ঠিক ওই সময়েই বিশ্বের সঙ্গে আলাপ।

আমাদের বিশ্ব ?

হ্যাঁ, তোমাদেরি বিশ্ব।—মেয়েটি বললে, ও বললে, ও ভারতীয়। আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। ও বললে, চল। আমিও বললাম, চল।…এলাম। ওদের দলটাকে জানতাম। মেয়ে চুরি ওদের যে ব্যবসা, এটা হোটেলের নাচিয়ে মেয়ে হয়ে আমি আর জানব না! অনেকের অনেক গোপন খবরই তো জানতাম!

দু হাতে মাথা চেপে বসেছিল জো, হঠাৎই বলে উঠল, বড্ড ভুল করেছ!

ভুল!—খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, না। করুক না আমাকে চুরি, নিয়ে যাক না যেখানে হোক, আমি তো দেখতে চাই, কী আছে আমার জীবনের শেষে!

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ মেয়েটি, তারপর বললে, তোমার কথাও শুনেছি বিশ্বের কাছে। আমারই মত এক হোটেলের মেয়ের দিকে তুমি ঝুঁকেছিলে!

সোজা হয়ে বসে দুটি হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকাল জো—আবেগে আর উত্তেজনায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ। কিন্তু সেদিকে ভাল করে লক্ষ্য না করেই বলে উঠল মেয়েটি, ওই ব্যাপার নিয়ে হিংসেয় জ্বলে উঠে একটা মানুষকে তুমি মেরে ফেলেছিলে।

ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জো মেয়েটির ওপরে, ওর নরম পাখির মত গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে বলতে লাগল, আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না!

কয়েকমুহূর্ত ওই ভাবে কাটিয়ে দিয়ে, শান্তভাবে ওর হাত দুটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললে, খুব বীরত্ব! একটা মেয়ের গলা টিপে—আচ্ছা পুরুষ যা-হোক!

—তুমি চুপ করবে কিনা!

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফিক করে হেসে ফেললে, —বললে, অমন করে আচমকা ধরে! আমি তো শেষই হয়ে যেতাম। সেটা কী ভাল হত!

—বেশ হত। কে আমার কী করত!

মেয়েটি বললে, কিছুই না। যেমন তোমার বন্ধুরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, তুমি আর যেমন ভয়ে ফিরতে পারছ না ভিক্টোরিয়ায়, তেমনি লুকিয়ে থাকতে হত না কোথাও। তবে তোমার মনে-মনে খুব দুঃখ হত? হত না?

অসহ্য! মেয়েটা ওর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিতে চায়! তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার খিল খুলে ও বাইরে বেরিয়ে গেল? অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি বাইরে। একটা বুড়ো জামগাছ বুঝি উপড়েই পড়ে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে টুকরো পাথরও ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক!

সারাটা দিন এমনি ভয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল জো। মেয়েটি বাইরে এসেছিল কি না কে জানে। আর সেই জো? বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল তো? না গেছে তো বয়ে গেছে! অত অভিমানের ধার ধারে না সে। এবারে কারুর কথা সে শুনবে না, বুড়োটাকে সে কাটবে বই কাটবে।

এল রাত। মেয়েটা ভয়-ডর পাবে না তো? পাক না, ভয়ডর পেয়ে কেঁদে ওঠাই তো উচিত। ও কাঁদবে, আর বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দে কিছুই শুনতে পাবে না জো, বেশ হবে!

রাতটাও কাটল। সকালে সামান্য একটু ধরেছিল বৃষ্টিটা। বাইরে এল জো। মেয়েটার ঘরের দরজা খোলা। স্নান করতে গেল নাকি? পাহাড়ী পুকুর, জল পেয়ে এখন কানায়-কানায় ভর্তি। পা পিছলে মেয়েটা যদি গিয়ে তাতে পড়ে? সাঁতার জানে তো?—না জানুক, বয়েই গেল। ওরা আসবে—মেয়েটা কই? জো বলবে, শেষ। তোমাদের হাত ফসকে পাখি পালিয়েছে—ওরা রেগে বলবে, চল্ তোকে ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে যাই। ও যাবে না। এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে তার মন মিশে গেছে, আর যাওয়া চলে না এ জায়গা ছেড়ে।

বৃষ্টিতে বহু ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ঝোপে ঝোপে এধারে

ওধারে খুশী-হওয়া ঝরনার ঝর্ঝর্! যেন একটি নয়, বহু মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে সারা পাহাড়টা জুড়ে! তরতর করে নেমে এল নিচে। বুড়ো জো ঘরে যায় নি, শক্ত খোলের নিচে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পার করে দিয়েছে সব ঝড় বৃষ্টি বিপর্যয়।

শুনেছিস?

অনড়, অটল একটা প্রস্তর খণ্ড। সাড়ার লক্ষণও নেই।

মেয়েটা আমার এই ডান হাতটা ধরেছিল, জানিস? কী রে? ও ঘুমোচ্ছিস বুঝি? আচ্ছা ঘুমো।

একটা ঝরনার জলে নিজেও স্নান সেরে নিল জো, তারপর লম্বা প্যান্টটা আবার পরে নিয়ে কম্বল জড়িয়েই ওপরে উঠে এল সে নিজের ঘরে। আশ্চর্য ঘটনা, তার নিজের খাটে বিছানার ওপরে লাল একটা শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটি।

বললে, কথা কইব বলে বসে আছি।

জো বললে, পরশুইত তো বিশ্ব আসছে।

—আসুক।

—চলেই তো যেতে হবে তোমাকে।

—যাব। বলেই মেয়েটি আবার হাসে, বলে না-ও যেতে পারি।

—সে উপায় নেই। ওদের চেন না।

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, দেখ, সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোথাও যাব না। এখানেই কাটিয়ে দেব বাকী জীবন! এটাকেই বানিয়ে নেব আমার স্বপ্নের গুজরাট!

—কেন?

মেয়েটি বললে, মানুষ তো অনেক দেখলাম। এবার নির্জনতাটাই ভাল করে অনুভব করে দেখি। থাকতে দেবে না আমাকে তুমি এখানে?

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে জো, বললে, কিন্তু ওরা দেবে কেন?

ওদের সামলানোর ভার আমার ওপর। ভেব না, ওদের পোষ মানাতে হয় কী করে তা আমি জানি। জানি না তোমাকে। তুমি খাঁটি পুরুষ—মনের দিক থেকেও।

ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জো। কনভেন্টে পড়া মেয়ে কত কথা জানে, যার মানেও বোঝা যায় না সব সময়।

মেয়েটি বললে, মানুষ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। থেকে যাই এখানে। তুমি যা বলবে করব। তবে তোমার ঐ কাছিম মারা আর চলবে না। কাজ যখন করতেই হবে, নারকেল-পাড়ার কাজ ধর। সারা বছরের রুটির পয়সা ওতেই চলে আসবে। তারপরে দুটি-একটি খোকা-খুকু যদি আসে—

দুটি হাতে দুটি কান চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে আসে জো সেই ঝর্‌ঝর্-ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টিধারার মধ্যে।

—এই জো, শুনছিস?

সে কিন্তু তেমনি অনড়, অবিচল। বায়ু টেনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুম্ভক করে ওভাবে ওরা থাকতে পারে।

—এখনও ঘুমোচ্ছিস! সর্বনাশ হল যে এদিকে! মেয়েটি কী বলে জানিস?

বৃদ্ধ প্রাণীটি নির্বিকার। তার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভিজতেই থাকে জো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে, তোর বুক আর চিরে ফেলা হবে না। কারুরই বুক আর চিরতে পারব না। আমাকে এবার নারকেল পাড়ার কাজ করতে হবে। তা আমি খুব পারি। কিন্তু জোনাথানরা যদি রাজী না হয়? রাজী না হয় তো ওদের শেষ করব!···
কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল জো। না-না হিংসে করতে নেই। ওই যে কাদের কথা বলল মেয়েটা, মাছমাংস খায় না, কাউকে হিংসেও করে না, সেই জাতের মত হবে সে।

পরদিনও অমনি ঝড়। বুড়ো জোকে কোনক্রমে হটিয়ে-হটিয়ে তার ঘরে উঠিয়ে রেখে এল জো। বললে, ঘরে থাক্। আমিও ঘরে থাকব। মেয়েটা কী বলে জানিস? বলে, লোক তুমি ভাল। সঙ্গী নেই সাথী নেই একা একা থাকতে থাকতে তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁরে, তোরও তো জুড়ি নেই, তোর মাথাটা আবার খারাপ হয় নি তো!

বলতে-বলতে নিজেই হেসে উঠল জো, বললে, মাথা নেই, তার

মাথাব্যথা। মাথা কই তোর ? আছে তো দুটো জলজলে চোখ ! আমারও আছে। মেয়েটি বলেছে আমার চোখ দুটো নাকি সুন্দর !

পরদিন বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে থেমে গেল ঝড়। কিন্তু কোথায় জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব ? জো আবার নিচে এল, বুড়োর ঘরটা খুলে ওকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, থেমেছে বৃষ্টি। আর কেন। এবার একটু ঘুরে বেড়া।

বৃদ্ধ জো কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল —মুখ বার করে বালি সরিয়ে।

মেয়েটা মরেছে জানিস ! আমাকে ছাড়া থাকতে চাইছে না। বলছে, কোথাও আমি যাব না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা বিয়ে করে ফেলি, কী বলিস ? ওই যে পাহাড়ের ওপরের লম্বা পাথরটা, ওর উপরে একটা পাথর চাপিয়ে 'ক্রস' তৈরী করেছি। মেয়েটিকে বলেছি, ওই আমাদের গির্জে। ওখানেই বিয়েটা হবে। ওই জায়গাটার নাম কী দেব, জানিস ? গুজরাট। কী, অমন করে চাইছিস কেন ? কথাটা মনে ধরছে না ? না-না, তোকেও দেখব রে, সমান যত্ন করব। মেয়েটাকেও পাঠাব তোর কাছে। দু জনে মিলে যত্ন করব।

ঠিক এর পরদিনই এল ওরা। সেই লঞ্চ, সেই বার্জ। জো বললে, আমি আর কাছিম কাটব না।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা।

বিশ্ব গিয়েছিল ওপরে, মেয়েটির কাছে। সে হাসতে হাসতে নেমে এল ওদের কাছে, বললে, ওহে পাহাড়ের মাথায় চার্চ হয়েছে। মেয়েটা বিয়ে করছে জো-কে।

জোনাথান আর জোহার হাসবে কি কাঁদবে, বুঝে পেল না। জোনাথানের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিশ্ব বললে, মেয়েটি আজীবন থাকবে এখানে জো-র কাছে।

এতক্ষণে কলরব করে উঠল ওরা, তা কি করে হবে ?

হোক ! বিশ্ব বললে, জো আমাদের অনেক করেছে। ওর জন্য এটুকু স্বার্থত্যাগ আমাদের করতেই হবে। জয় হোক জো-র।

অতি সহজেই মিটে গেল ব্যাপ্যারটা। জো-কে বাদ দিয়ে ওরা নিজেরাই কাটতে লাগল কাছিম। ওরা বললে, ওর বিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ফিরব।

জোনাথান বললে, বিশু, বুড়ো কাছিমটাকে কাটতে হবে যে! ওর খোল না হলে তো বিয়ে হবে না। জান না বুঝি? আমাদের সিসেলিয়ানদের এই নিয়ম। ওই খোলে কিছু মসলা আর শাকপাতা জল দিয়ে ঢেলে সিদ্ধ করতে হয় উননে। সেই জল না মুখে দিলে বিয়ে সিদ্ধ নয়। ছোট কাছিমের খোলে চলবে না, চাই একেবারে ওই বুড়োটার মত 'টেসটিডো এলিফ্যানটিয়া'র খোল।

সারাটা দ্বীপে 'টেসটিডো এলিফ্যানটিয়া' আর একটিও নেই ওই বুড়ো জো ছাড়া! কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সে 'বৃদ্ধ'র কাছে। প্রথমে মনে হল—না-না, ওকে সে কাটতে দেবে না। কিন্তু ওর ওই পোখরাজ মণির মত চোখের বিদ্যুতের মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যঙ্গের ঝিলিক লক্ষ্য করে যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল জো। তার মনে হল—এইবার ঠিক হয়েছে। দশ-দশটি বছর ধরে প্রতিটি সকাল আর বিকেল ও যেন ফাঁকি দিয়ে এসেছে তাকে। এতদিন এত জীব সে মেরেছে, এত জীবের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলা করেছে সে, এই বৃদ্ধ নিজের চোখে সব দেখেছে আর মিটিমিটি করে তাকিয়েছে তার দিকে, যেন বলছে আমাকে কাটতে আর যে-ই পারুক অন্তত তুমি পারবে না। কিন্তু এইবার উৎকট আনন্দে একেবারে চিৎকারই করে উঠছে জো, বিয়েতে তোমাকে লাগবেই, আমাদের নিয়ম! নিয়মের বাইরে যেতে পারি না, কখনই পারি না! কিন্তু যাই-হোক নিয়ম, জো কি সত্যি বিয়ে করবে না কি শেষ পর্যন্ত এবং এই নির্জন দ্বীপে বাস করবে নাকি মেয়েটিকে নিয়ে? পাগল হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে মেয়েটি তার সঙ্গে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে! কিন্তু তবু লোভ! তবু ভীরু কল্পনা একটি ঘরের, একটি স্ত্রীর, আর সন্তানের! কিন্তু, তারপর? তারা ফিরে যাবে একদিন ভিক্টোরিয়ায় কিন্তু কি দেবে পিতৃ-পরিচয়? বলবে কি যে, এক জঘন্য অপরাধে অপরাধী এক ফেরারী পিতার পুত্র তারা? না-না, তা

হয় না। তার চেয়ে, এই পশুর মত কচ্ছপের হৃৎপিণ্ড চিরে বার করবার কাজ অনেক ভাল!

পাঁচ-ছ-টা দিন তারপর কেটে গেল নিষ্ক্রিয়ভাবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে আপন মনে কী যেন ক্রমাগত ভাবছে সে। জোনাথান ঠাট্টা করে বলে, জোর চিন্তা কিন্তু অন্যদিকে। হবু-বর পালায় কোথায়?

যে মাংস কাটতে জো-র লাগত একদিন, কি দুদিন, সে কাজে ওদের পাঁচ-ছ-দিনের বেশী লাগছে। দেখে দেখে হাত নিশপিশ করে ওঠে। অথচ ওতে হাত দিলে হয়তো ক্ষেপেই যাবে গুজরাটের মেয়ে।

অবশেষে একদিন সারারাত বিনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসল জো। ওরা সবাই উঠোনে ঘুমে আচ্ছন্ন, মেয়েটির ঘরের দরজাও বন্ধ। তাড়াতাড়ি ও নেমে এল নিচে, বললে, শুনছিস? মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। নইলে আমাকে বিয়ে করতে চায়? না-না, আমি তা হতে দিতে পারি না। এখানে দিনের পর দিন একা থাকতে-থাকতে ও মরেই যাবে। আমি থাকি, আমার আর কোথাও স্থান নেই, তাই। কোথা থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ, আরব, কি মিশর, তা-ও জানি না। ওর বাবার ডায়রি থেকে ও তো জেনেছে, ও কোথাকার মেয়ে! ও চলেই যাক সেখানে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে এতদিন পরে যেন মনে একটা মুক্তির হাওয়া এসে লাগে।

সে আগের মত চকচকে দা দিয়ে আবার কাটতে আরম্ভ করে কাছিমগুলো, রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলি বার করে আনতে থাকে দু-হাতে করে!

—এ কী করছ?

হলদে শাড়ি পরে তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, বেদনার্ত দুটি চোখের দৃষ্টি—বললে, বারণ করেছিলাম না!

একমুহূর্ত নিস্পন্দের মত ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তারপর হো-হো করে হেসে উঠল জো, শুনব কেন তোমার বারণ! তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু এ আমি ছাড়তে পারব না!

ক্ষোভে-দুঃখে আরক্ত দেখায় মেয়েটির মুখ, দুটি চোখ যেন জ্বলতে থাকে, বলে, এই তোমার মনের কথা ?

—হ্যাঁ।

দুরন্ত ক্রোধে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মেয়েটির কণ্ঠ, সে বলে, উঠে এস বলছি !

এবার আরেকটি হৃৎপিণ্ডে চকচকে ইস্পাতের আঘাত দেয় জো, গলগল করে বার-হওয়া রক্ত ধারায় আঙুলগুলি রাঙাতে রাঙাতে সে অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, না। তুমি যাও।

—উঠে এস বলছি।

—না। তুমি যাও।

—না ! দুর্দমনীয় ক্রোধের আবেগে মেয়েটি তখনও কম্পমান, বলে —আচ্ছা বেশ, তাই হবে।

দ্রুত পায়ে চলে যায় মেয়েটি ওর কাছ থেকে। আরেকটি জীবকে অভ্যাস মত কাছে টেনে নিয়ে আঘাত করতে গিয়ে চকচকে দা-টা তার হাত থেকে কিন্তু এবার পড়ে যায়। আর সে উঠিয়ে নেয় না সেই দা-টা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নিচে নামে, এধারে-ওধারে উদাসীর মত ঘুরে-ঘুরে কী যেন ভাবে সে, এক সময় অন্য ঘুর-পথে উঠে আসে সে পাহাড়ের মাথায়, তার গির্জের কাছে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুটি চোখ আপনিই বুঝি ভরে আসে জলে !

কেটে যায় দুটি দিন এমনি করে। বিশ্বের সঙ্গে মেয়েটি একান্তে কী আলাপ করে কে জানে, জো থাকে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে।

দুদিন পরে জোনাথানরা শুনতে পায় কথাটা। জো নয়, বিশ্ব মেয়েটিকে বিয়ে করছে। এখানেই, এই ভূমিখণ্ডেই। জো-র গির্জেতেই হবে বিয়ে। শুনে ওরা ঠাট্টা করে জো-কে, কী রে ফসকে গেল !

জো পশুর মত আবার দা-টা হাতে তুলে নিয়ে বাকী কাছিমগুলিকে

কাটতে শুরু করে। চিৎকার করে ওঠে থেকে থেকে, সেই আগেকার মতই বৃদ্ধ জোকে বলে, দেখছিস কি, এবার তোকেই কাটব।

কথাটা সত্যিই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। গির্জে থেকে বর-কনে নেমে এসে বসেছে ঘরে, জোনাথান-জোহাররা জামার গায়ে ফুল লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছে। কে যেন হেঁকে বললে, কই, কোথায় সেই কাছিমের খোলটা? ওটা না হলে বিয়ে হবে কী করে? জোহার বোধহয় ওকেই ঠাট্টা করে কী যেন বলে উঠল! জোনাথান বলল, পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? খোলটা নিয়ে আয়! কাটতে মায়া হচ্ছে নাকি? জোহার হেসে বলল, মায়া! ওতো একটা কসাই! কাছিমের বুক চিরে চিরে বুড়ো হয়ে গেল, ওর আবার মায়া-মমতা! জোনাথান বললে, তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে? না কি শেষপর্যন্ত হিংসে হচ্ছে বিশ্বের ওপর? বলেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল সে। পাগলের মত ছুটে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল জো। হাফ্‌প্যান্টপরা খালি গা—হিংস্র জন্তুর মতই গুঁড়ি মেরে মেরে বুড়ো জো-র কাছে এসে বসল চক্‌চকে প্রকাণ্ড খাঁড়াটা নিয়ে। একটু দম নিয়ে তারপর বললে, সত্যিই তোকে দরকার। তোর খোলটা না হলে নাকি বিয়ে হবে না! দে, দে তোর খোলটা।

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ। থরথর করে কাঁপতে থাকে সমস্ত দেহটা। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই অস্বাভাবিক শক্তিতে পশুর মত একটা হাঁক দিয়ে দু হাত দিয়ে সজোরেই উল্‌টে ফেলল 'বুড়ো জো-কে। তারপরে চকচকে ধারাল খাঁড়াটা দিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডটা চিরতে গিয়ে অতর্কিত বিস্ময়ে থম্‌কে থেমে গেল জো।

কাকে সে কাটবে? তাকে যে সে সত্যিই একদিন কাটতে পারবে, এটা দেখবার আগে বৃদ্ধ নিজেই চলে গেছে সব কাটা-ছেঁড়ার বাইরে। বোধ হয় অভিমানে, এক নিদারুণ দুঃখে, অব্যক্ত অভিমানে।

হাতের খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জো, জোনাথানকে উদ্দেশ্য করে কোনক্রমে বলে, নিয়ে যাও এই খোলটা, দাও গিয়ে বিয়ে।

সে নিজে আর দাঁড়ায় না, তরতর করে নেমে যায় নিচে, আরও নিচে। নিস্তরঙ্গ সরোবরটা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে।

ভিক্টোরিয়ায় জো-র একটা বিবর্ণ ছবি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে জো-র কাহিনী শেষ করল বিশ্ব—বললে, সেই থেকে জো-কে আর কেউ কখনও কোথাও দেখতে পায় নি।

আজও জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরে এতক্ষণে-উঠে-দাঁড়ানো সেই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল—সত্যি কথা, এদের সচরাচর দেখাও যায় না।

সূর্যপুত্র সাবর্ণি

ছটফট করে কাটছে সারারাত, ঘুম আসছে না কিছুতেই। কখন ঘড়ির কাঁটাটা গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের ঘরে, সমস্ত তমসা দূর করে কখন উদিত হবেন তিনি! কত বিচিত্র রাতই তো কেটে গেছে এই সতেরো বছর ধরে, কত ভোরই তো হয়েছে! কিন্তু দূর উদয়চক্রে কখন আবির্ভূত হবে জবাকুসুমের মত এক অভিনব জ্যোতির্ময় বিন্দু, তার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এভাবে প্রতীক্ষা করা—ঠিক এ অবস্থা আগে কখনও হয় নি প্রণবের!

ডেক্-এ কোয়াটার-মাস্টারের পোস্টের কাছে কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা আছে—সূর্যোদয়ের সময়—পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। তার অর্থ হচ্ছে, ঘড়ির ছোট কাঁটাটা ওই যে তিনটের ঘর ছুঁয়ে আছে, আর বড় কাঁটাটা ছটোর, ওগুলো সরে সরে যাবে, ছোটটি যাবে পাঁচের ঘর ছাড়িয়ে আর বড়োটি ন-য়ে। আর সে তখন ঝকঝকে সাদা ইউনিফর্মে থাকবে ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে, হাতে তার বিউগ্‌ল্—সেটা সে বাজানো মাত্রই জাহাজের ফ্ল্যাগস্টাফে উঠে যাবে ত্রিবর্ণ পতাকা, আর যে-যেখানে থাকবে, ক্যাডেট্ থেকে অফিসার, সবাই অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে একযোগে করবে স্যালিউট। কোয়ার্টার-মাস্টার থেকে ছোট-বড় সব অফিসারের হুকুমের অধীনে সর্বক্ষণ থাকতে হয় যে ক্যাডেট্‌কে—সেই ক্যাডেটের হাতের বিউগ্‌ল্-এর নির্দেশ মানবে সবাই, এ কী কম আত্মপ্রসাদ! তাই, 'সানরাইজ-বয়' হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নেভীর প্রতিটি ছেলের মধ্যেই তীব্র।

কালো বোর্ডটায় কম্যাণ্ডিং অফিসারের নামের নিচেই তার নাম খড়ি দিয়ে লেখা আছে—'সানরাইজ-বয়'—সি তিন হাজার অতো—প্রণব চ্যাটার্জি। বিছানা ছেড়ে আর সব ঘুমন্ত ছেলেদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ধীর পায়ে সেই কালো বোর্ডটার কাছে এসে দাঁড়াল

প্রণব। রাত্রের ডিউটিতে নিযুক্ত সেন্ট্রিটি ওকে দেখামাত্রই এল এগিয়ে। বললে, কেঁউরে, অভীতক্ সোয়া নেহী ?

যথারীতি স্যালিউট জানিয়ে উত্তর দিল প্রণব, নহী সাব।

—তুমহারা চিঠি মিলা ?

—জী হাঁ।

আজই রাত্রে এসেছে তার চিঠি। তার নেভীর জীবনে বহু প্রতীক্ষিত এই প্রথম চিঠি। কিন্তু বোধ হয়, না এলেই ভাল ছিল।

স্নায়ু-শিথিল ঘুমন্ত শরীরে হৃৎপিণ্ডটা যেমন ধুকধুক করে চলতে চলতে জানিয়ে দেয় দেহটা নিষ্প্রাণ নয়, তেমনি বন্দর-লগ্ন গতি-শিথিল এই ছোট সরকারী নৌবিভাগীয় জাহাজটিরও মৃদু কম্পন অনুভব করা যায় ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনরুমের ইঞ্জিনগুলি স্তব্ধ, বড় বয়লার-দুটোও নির্বাপিত, শুধু বিদ্যুৎশক্তির প্রবাহকে অব্যাহত রাখবার জন্য ধুকধুক করে চলছে অক্সিলিয়ারী ছোট্ট বয়লারটা।

সেন্ট্রির অনুমতি নিয়ে ডেকের ওপর লঘু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্রণব। বেস্ থেকে জাহাজের ডিউটিতে আসাও তার জীবনে এই প্রথম। ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখটি সে লাল পেন্সিল নিয়ে ভাল করে দাগ দিয়ে রেখে এসেছে। অনেকগুলি প্রথম ব্যাপার তার জীবনে ঘটল বা ঘটতে যাচ্ছে আজ। লেফটেনাণ্ট চ্যাটার্জির ঠিক সরাসরি অধীন হয়ে কাজ করাও আজ তার প্রথম। কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে তার নামের ওপরেই বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেনাণ্ট কে কে চ্যাটার্জি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজটির চার্জ নিয়ে তিনি সবে এখানে এসে পৌঁছলেন বোম্বে থেকে এই আজই। না না, রাত বারোটা পার হয়ে গেছে, ইংরাজী নিয়মে আর আজ বলা চলে না, বলতে হবে কাল। কাল বেলা প্রায় দশটা—তিনি এলেন। তারা সব তাঁরই প্রতীক্ষায় ডেকের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। এক বছর পরে দেখা, তিনি কী চিনতে পারবেন প্রণব চ্যাটার্জিকে ?

পারলেন কিন্তু! তার কাছে এসে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন ঠোঁটের কোণে। আর তাই দেখে আনন্দে শরীরের সমস্ত রক্ত

যেন একবার ছলাৎ করে ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল বুকের মধ্যে! কে জানে, এই দীর্ঘ দু বছর নৌ-বিভাগীয় জীবনে যে সুযোগ সে কখন পায় নি, সেই সানরাইজ-বয় হবার সৌভাগ্য সে লাভ করল হয়তো তাঁরই দয়ায়! তা-ও বেস্-এর ডিউটিতে নয়, একেবারে জাহাজের ডিউটিতে! সেই যে সকালবেলা দেখা হয়েছিল, তারপরে দেখা হল একেবারে রাত্রে, যখন তিনি রাউণ্ডে বেরিয়েছিলেন। কথাও বলেছিলেন। সে আর থাকতে পারে নি, বাঙালী প্রথায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলেছিল একেবারে। রাগ করেন নি, স্নেহমণ্ডিত সেই হাসিই ফুটে উঠেছিল মুখে, বলেছিলেন—এক বছর পরে দেখা। ভাল আছ প্রণব?

তারপরে বলেছিলেন, একটা চিঠি এসেছে তোমার। খামে। পেয়েছ তো?

—পেয়েছি স্যর।

একটু থেমে আরও একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কার চিঠি?

—মায়ের।

একটু থেমে তারপরে আরও প্রশ্ন করলেন, তাহলে পাও মায়ের চিঠি?

—এই প্রথম পেলাম স্যর।

—ও।

বলেই আর দাঁড়ালেন না, যেমন রাউণ্ডে ঘুরছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার সঙ্গে যে বিশেষভাবে কথা বললেন তা নয়, প্রত্যেকের সঙ্গেই এমনিভাবে কথা বললেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি চলে যেতেই, ছেলেরা এসে ঘিরে ফেলল তাকে? জাহাজে যে-তিন-চারটি বাঙালী ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে সমর দাস একজন। বললে—এই, চ্যাটার্জি-সাব তোকে চিনত নাকি আগে থেকে?

—হ্যাঁ। উনি যে এই বেস্-এ ছিলেন বছরখানেক আগে।

—তুই তো এই বেস্-এর। বল্ না ভাই, কেমন লোক উনি?

—ভাল! খুব ভাল।

—ইশ!—মল্লিক বলে আরেকটি ছেলে এগিয়ে এল—তুমি তো চাঁদ

ওর অধীনে থাক নি এর আগে, তাই জান না! পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসবার উপায় নেই! কাজের একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কী, তো, ব্যস্!

সমসের বললে, এই যে কাল তুমি সানরাইজ-বয় হচ্ছ, বিউগ্ল্-এর স্বুর তুলতে একটু ভুল করে দেখো না, কী হয় একবার!

আরেকজন বললে, ভুল তো দূরের কথা, গলাটা একটু কেঁপে যাক না, একেবারে বেত-মারার হুকুম দিয়ে বসবে হয়তো!

পূবের রেলিং বা বুলওয়ার্ক-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পূর্বদিগন্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রণব বহুক্ষণ ধরে। বন্দরের মুখটিতে সমুদ্রের জল লাইট হাউসটা পেরিয়ে ঢুকে এসেছে ভিতরে, তিনটি শাখায় গেছে বিভক্ত হয়ে —তারই একটি শাখার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জাহাজটা। এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলে, এই শাখাটি আসলে পুরাতন এক নদীর খাত—মেঘাদ্রি তার নাম। পূর্বঘাট-পর্বতমালার কোনও নিভৃত গুহা থেকে ঝরনার মত বেরিয়ে এসে বিভিন্ন প্রান্তর, বিভিন্ন জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে মিলেছে এসে সমুদ্রে। সঙ্গমের এই প্রসারতাকে আরও প্রসারিত করে সমুদ্রের লবণাক্ত নীল জল আরও ভিতরে প্রবাহিত হতে দিয়ে, ড্রেজারের সাহায্যে আরও গভীর করে নিয়ে গড়ে উঠেছে এখানে বিস্তৃত এই বন্দর।

দিগন্তে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারাটি। এক সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা তা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছিটকে পড়েছে জলে, জলের ওপর একটা আলোর রেখা টেনে পৌঁছেছে সেই জ্যোতি একেবারে তাদের জাহাজে, প্রায় তাকে এসে ছুঁয়েছে যেন!

আর বেশী দেরি নেই, তাকে প্রস্তুত হতে হবে। স্নান করতে হবে তাকে এখ্খুনি, ঝকঝকে ধোপদুরস্ত পোশাক পরতে হবে! শুদ্ধাচারে সেই প্রাচীন তপোবনের বিদ্যার্থীর মতই সূর্য প্রণাম করতে হবে তাকে যেন! তার উপনয়নের সময় সেই যে মা তাকে তিনখণ্ড উপনিষদ্ উপহার দিয়েছিল—তা তার আজও সঙ্গে আছে—আজও সে পড়ে মাঝে মাঝে

লুকিয়ে লুকিয়ে। কিছুই বোঝে না, তবু ভাল লাগে পড়তে। সংস্কৃত ঠিক মত পড়তে পারে না, পড়ে বাঙলায় ব্যাখ্যা করা অংশগুলি।

আজকের এই যে সূর্যপ্রণাম, এ সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব নামের উপাসনার মত যেন! সাত অবয়ব না হোক, তিন অবয়ব তো বটে! "উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে রূপ তাহাই হিঙ্কার!" পশুরা সূর্যের এই হিঙ্কার অবয়ব-এর ভজনা করে বলে তারা নাকি সূর্যোদয়ের পূর্ব "হিং" প্রভৃতি শব্দ করে থাকে। কে জানে সত্যিই করে কিনা, শ্বাপদসংকুল অরণ্যে সে তো থাকে নি কোনদিন!

"সূর্য প্রথম উদিত হইলে তাঁর যে রূপ হয়, তাহাই প্রস্তাব।" এই প্রস্তাব-রূপের ভজনা করে মানুষ, তাই তারা, উপনিষদ্ বলছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত। আর আশ্চর্য, যখন এই রূপ পরিগ্রহ করবেন সূর্যদেব, তখনই বাজবে আজ পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ, আর তাকে বাজাতে হবে তখ্‌খুনি তার ঝকঝকে বিউগ্‌ল্‌টা, পতাকা উঠে যাবে, সবাই করবে প্রণাম একযোগে। সেই উপনিষদের যুগ থেকে আজও পর্যন্ত মানুষ "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত।"

এর পরের মুহূর্তটাকে বলা হয়েছে "সঙ্গববেলা"। সঙ্গববেলায় "সূর্যরশ্মি ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়"। সেই সময় তাঁর যে রূপ, তা-ই "আদি"। পাখিরা এই আদিরূপের "ভজনা করে বলিয়াই তাহারা কেবল আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিরাবলম্বভাবে গগনে বিচরণ করে।"

এই অংশটা ভাল করে দাগ দেওয়া আছে প্রণবের বইয়ে। সেই বেস্‌-এ থাকার সময়ই তার যখন সানরাইজ-বয় হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ শত চেষ্টাতেও সে সুযোগ সে পায় নি, তার বন্ধুরা একে-একে বেস্‌-এর সে উঁচু ফ্লাগ-স্টাফের নিচে দাঁড়িয়ে বিউগ্‌ল্‌ বাজিয়েছে, আর সে সবার সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়েছে শুধু—সেই তখনি তার একমাত্র 'ঐশ্বর্য' তার মায়ের দেওয়া উপনিষদের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ সে পেয়ে যায় ছান্দোগ্য-র ওই পৃষ্ঠাটা—ভাবার্থ না বুঝলেও কথাগুলো ভাল লেগে যায় তার, লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ

দিয়ে রাখে। এরপর বার বার সে পড়েছে জায়গাটা, অর্থ না বুঝলেও কথাগুলো ভাল লেগেছে তার!

লেফটেনান্ট চ্যাটার্জি ছিলেন তখন ওই বেস্‌-এ। তাঁর সঙ্গে অফিসের দিক থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, মাঝে মাঝে দু-একবার অ্যাস্ট্রনমির ক্লাস নিতে আসতেন শুধু। বোর্ডে এঁকে এঁকে বুঝিয়ে দিতেন কাকে বলে ধ্রুবতারা, কাকে বলে 'আলফা সেঞ্চুরী'। কিন্তু প্রণব ছিল অঙ্কে কাঁচা, তাই এগিয়ে যেতে পারত না সে। বোটে গিয়ে কোয়ার্টার মাস্টারদের অধীনে 'রোয়িং' শেখা, আর নিয়মিত 'প্যারেড-করা—এছাড়া কী-ই বা শিখতে পেরেছে সে ভাল করে? 'গানারী'-বিভাগ বা কামান ছোঁড়ার ব্যাপারটা শিখে নিতেই তার সব থেকে বেশী আগ্রহ ছিল, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষাতেই সে ফেল করল।

লেঃ চ্যাটার্জির মেস-এ তাঁর ঘরে গিয়ে একেবারে কেঁদেই ফেলেছিল সে, মনে আছে।

বললেন, কী ব্যাপার প্রণব?

সমস্ত বেস্‌-এ এই একটি লোকই ছিল যাকে সে প্রাণ খুলে সব-কিছু বলতে পারত। সব-শুনে তিনি বললেন, অত বিচলিত হচ্ছ কেন? তোমাকে সিগ্‌ন্যালিং কোর-এ দিয়েছে, এই তো! সিগন্যালিং-ই বা মন্দ কী, বেশ শেখবার জিনিস!

—কিন্তু 'গানারী'তে যেতে পারলাম না যে!

একটু থেমে, তারপর একটু হেসে বলে উঠেছিলেন, অত বন্দুক কামান ছোঁড়ারই বা শখ কেন তোমার?

কথাটা শোনামাত্র বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল একবার? তার হৃদয়ের স্পন্দনটুকুও কি ইনি চিনে ফেলবেন নাকি? সে মারণাস্ত্র কিছু ছুঁড়ে দিচ্ছে নিজের হাতে, আর তার আঘাতে তার সামনে কোন কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, এ দেখবার একটা পৈশাচিক ক্ষুধা তার মধ্যে পশুর মত হিংস্কার তুলে ফিরছে, এ সংবাদও কি গোচরে আসবে ওঁর?

•

নেভীতে এসে ঢুকেছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে? না পালিয়ে উপায়ও

ছিল না। বুড়োবয়সে তার দিদিমা নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছিল খুব, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তার পক্ষে আর কলকাতায় পড়ে থাকা প্রায় অসম্ভবই হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

বড্ড রাগী আর জেদী তার মা, হাতের কছে পড়ে থাকা সেই বড় লোহার তালাটাই ছুঁড়ে মেরেছিল প্রণবকে।

দরদর করে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, আর তাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা দিদিমার সেই চিৎকার—ও রে মেরে ফেললে রে, ছেলেটাকে খেয়ে ফেললে রে রাক্ষুসী!

মা-র কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে নির্বিকার চিত্তে তার সেই রঙিন হাতব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের বাড়ি। বলেছিল, একটি পয়সাও আর দেব না, একটি পয়সাও আর খরচ করব না হতভাগা ছেলেটার জন্য!

কপালে সেই কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে। চ্যাটার্জি সাহেব একদিন বুঝি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তোমার কপালে ও কিসের দাগ, প্রণব?

—ও কিছু নয়, ছোট বেলায় একবার পড়ে গিয়েছিলাম স্যর।

অভিভাবকের সম্মতি ও স্বাক্ষর ছাড়া নেভীতে ঢোকা অসম্ভব। এই চ্যাটার্জি সাহেবের দয়াতেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রণবের পক্ষে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয়েছিল। সে যখন হতাশ হয়ে রিক্রুটিং অফিস থেকে ফিরে আসছিল, কে একজন বলেছিল, তুমি তো বাঙালী, এখানে একজন বাঙালী অফিসার আছেন—লেফটেনাণ্ট কে কে চ্যাটার্জি—তাঁকে গিয়ে ধর, হয়েও যেতে পারে।

তা-ই হয়েছিল, বাঙালী বলে বাঙালীর প্রতি ছিল তাঁর টান, তিনি নিজে অভিভাবকের হয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। নিজে নাকি বিপত্নীক, নিঃসন্তানও।

সেকেণ্ড ক্লাসে সবে উঠেছে স্কুলে, এমন সময় হল তার উপনয়ন। প্রতিবারেই পরীক্ষার ফল ভাল হয় তার, এবারেও হয়েছে।

তবু মা এসে ধমক দিতে ছাড়ে নি—অঙ্কেতে কম পেলি কেন রে হতভাগা ?

'হতভাগা' ছাড়া তাকে কথাই বলত না তার মা, তবু অদ্ভুত তার টান ছিল মায়ের ওপর। মনে হত, মায়ের এই যে তাকে প্রতিপদে হতভাগা বলা, এর মধ্যে মায়ের এক গভীর কান্না লুকিয়ে আছে। তাকে দিদিমার কাছে রেখে মা থাকে অন্য জায়গায়! মা চাকরিও করে যেন কোথায়, মায়ের মুখে পাউডারের ছোঁয়া, হাতে রঙিন হাতব্যাগ, এরও মধ্যে কী এক শোচনীয় দুঃখ যেন লুকিয়ে আছে!

চ্যাটার্জি সাহেবকে তার মায়ের কথা বলতে গিয়ে একদিন সে কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝর্ করে। সবাই পায় মায়ের চিঠি, পায় বাপের চিঠি, দিদির চিঠি, ভাইবোনদের চিঠি, তার আসে না কিছুই। ডাক নিয়ে কোয়ার্টারমাস্টার নিজে বিলি করে, কত প্রত্যাশা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকায় যে কতদিন! কিন্তু না, একটি আঁচড় কেটেও তার কুশল প্রশ্ন করে নি কেউ!

চ্যাটার্জি-সাহেব বোধ হয় বুঝতেন তার মনের ব্যথা, বলতেন—তোমাকে কেউ চিঠি লেখে না ?

—না।

—তোমার দিদিমা ?

—সে লিখতে পারে না।

—তোমার মা তোমার ঠিকানা জানেন তো ?

—হ্যাঁ। কত চিঠি দিয়েছি মাকে!

—তবু উত্তর নেই ?

—না।

বেস্-এ ছেলেরা তাকে বড্ড খেপাতো। সে চুপচাপ থাকত তার উপনিষদ্ নিয়ে, ছেলেরা সেটা সহ্য করতে পারত না। কেউ তার বাবার গল্প করছে, কেউ মায়ের, কেউ দিদির বা ভাইয়ের, কিন্তু তার গল্প শোনবার ধৈর্য ছিল না কারুর! আর কা-ই বা গল্প করবে সে ?

একমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবই ছিলেন ওখানে তার ভরসাস্থল। মাঝে

মাঝে ডেকে পাঠাতেন তিনি। কেন যেন অদ্ভুত স্নেহ করতেন তিনি ওকে। তাই একদিন আর পারে নি, সমস্ত কিছুই বলে ফেলেছিল তাঁকে।

তার উপনয়নের কিছুদিন পরেই ঘটে ঘটনাটা। প্রথমে যেন শেলের মত বিঁধেছিল বুকে। কিছুই ভাল লাগত না, পড়াশুনাও না। ঘুরে-ঘুরে বেড়াত কলকাতার পথে পথে, উদ্দেশ্যবিহীন। স্কুলের বন্ধুরা করত মর্মান্তিক ঠাট্টা। কেউ বলত, তোর মা থিয়েটার করে, না?

আরেকজন বলত, তোর নতুন বাবা লোকটা কেমন রে?

বৃশ্চিক যেন দংশন করেছে তার সর্বাঙ্গে। এক-একবার মনে হত, এবার দিদিমার বাড়িতে মা এলে সে কথা বলবে না। কখনও মনে হত, মায়ের সেই রঙিন হাতব্যাগটা টান মেরে সে ফেলে দেবে।

কিন্তু মা যখন আসত দেখা করতে, তখন তার মুখখানার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাগ আর অভিমান কোথায় যেত হারিয়ে! অদ্ভুত একটা মায়া আর মমতায় অকস্মাৎ ভরে উঠত সারা মন।

মা-র ক্রোধের কিন্তু সীমা নেই—ইস্কুলে যাস না শুনলাম? কেন?

—আর যাব না।

—আর যাবি না! কেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল প্রণব—ওখানে আর পড়ব না।

আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল মা, পড়বি না!

—না। অন্য স্কুলে ভর্তি হব।

অনেক চেষ্টা করেছিল মা, অনেক বুঝিয়েছিল। সে কিন্তু তার সংকল্পে ছিল অটল। অবশেষে তা-ই হল, ভর্তি হল গিয়ে সে অন্য স্কুলে। ট্রান্সফার না নিয়েই। নিলেই নাম জেনে ফেলত তারা!

নতুন স্কুলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশ করতে হল।

—কী নাম?

মুখে এসে গিয়েছিল তার পুরনো নাম, প্রণব গাঙ্গুলী, কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল সে, শ্রীপ্রণব ঘোষ।

স্কুলের ফল খুব ভাল হল সেবার। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার

প্রাক্কালে আবার ঘটল বিপর্যয়। আবার বেঁকে বসল সে। না-না, আর সে পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না। মা তার বই-পত্র বিশেষ ধরত না, সেবার বই-খাতা-পত্রগুলি উল্‌টে তার নাম যেখানটায় লেখা থাকত, সেটা পড়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, প্রণব ঘোষ কেন?

উত্তর দেয় নি সে।

মা বলেছিল, তোকে এসব করতে বলে কে? তোর আসল উপাধি গাঙ্গুলী। সেটা ব্যবহার করতে দোষটা কী হল, শুনি?

কেমন করে এ-কথার উত্তর দেবে প্রণব। মায়ের পরিচিতি যদি হয়ে দাঁড়ায় মিসেস্ ঘোষ, তাহলে পুত্রের পরিচিতি গাঙ্গুলী, সেটা কত প্রশ্নের যে উদ্রেক করবে, মা কি তা বোঝে না? মায়ের সম্মান সে ছোট করবে কী করে?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকবার পর মা বলে উঠেছিল, তাই বুঝি পুরনো স্কুল বদলান হল? ট্রান্সফারও নেওয়া হয় নি, পাছে পুরনো নাম ব্যবহার করতে হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে যাবার মুখে মা আরও বলেছিল, এই ভাবে বুঝি মায়ের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে! কিন্তু কার কাছে?

বলতে বলতে চাপা একটা কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মায়ের কণ্ঠ, কিছু আর না বলতে পেরে, দ্রুত নেমে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল সে খুব ভাল পরীক্ষা দিয়ে। কিন্তু আর পড়া হল না। মায়ের প্রহার-চিহ্ন ললাটে ধারণ করে তাকে ছাড়তে হল কলকাতা, চলে এল এখানকার নৌ-বিভাগে।

—কী নাম?

ধীর, অকম্পিত কণ্ঠে এবার উত্তর দিয়েছিল সে—প্রণব চ্যাটার্জি।

সেই চ্যাটার্জি, যাকে নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে তার মা, তাকে সে দেখেও ছিল সেদিন! কিন্তু নেভীর এই লেফটেনাণ্ট চ্যাটার্জির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না! এঁর বয়স তাঁর থেকে হয়তো একটু বেশী, কিন্তু স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, শারীরিক গঠনে, দেহের বর্ণে এঁর সঙ্গে তুলনাই হয় না।

সে নিজেও অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করত এঁর প্রতি। নৌ-বিভাগীয়

সেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার দিনগুলি আজও মনে পড়ে। অঙ্কে তার বার বার ভুল হত, বার বার তিরস্কৃত হত সে। তবু তার মন বসত না পড়াশুনায়। রোয়িং-এ যখন চলে যেত তারা সমুদ্রের মধ্যে, তখন কী এক আনন্দে যেন ভরে যেত মন। ঢেউ লেগে অতর্কিতে লাফিয়ে উঠত বোটটা, ছেলের দল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠত, কিন্তু তার হত অদ্ভুত উৎকট এক আনন্দ।

সিগন্যালিং-ও ভাল লাগত না। ছুটি ফ্ল্যাগ ছুটি হাতে নিয়ে এ-বি-সি-ডি করে সিগন্যালিং করে যাওয়া—সে-ও যেন ক্লান্তিকর। ভাল লাগত কামান-ছোঁড়ার শিক্ষা দানের সময়টা। তার নিজের পক্ষে শেখবার সুবিধা ছিল না, কিন্তু সে দূর থেকে সব নিরীক্ষণ করত।

চ্যাটার্জি সাহেব ডেকে পাঠাতেন—কী হে প্রণব, কেমন লাগছে?

—ভালই স্যর।

একটু থেমে চ্যাটার্জি বলতেন, বড় ভাবপ্রবণ মানুষ তুমি। নৌ-সৈনিক তুমি, অত ভাবপ্রবণ হওয়া কী তোমার মানায়?

সামান্য কথা, কিন্তু তিরস্কারের তীর হয়ে এসে বিঁধে যেত তার বুকে।

বলতেন, ছোট বেলায় আমিও তোমার মত ছিলাম। বড় কষ্ট সয়েছি হে, বড় কষ্ট সয়েছি।

তারপরে হঠাৎ একদিন ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলেন তিনি বম্বে। দিন যায়, কিন্তু অব্যক্ত একটা হাহাকারে ভরে থাকে মন। কিছুই ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, সব বিষাদ, সব বিষাদ।

—কেন আপনি চলে গেলেন স্যর!—নিজের মনেই একা একা জলের ধারে বসে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করে প্রণব। কবে আসবেন স্যর? আমার যে আর কেউ নেই! আমার বাবাকে আমি কোনদিন দেখি নি, জানেন স্যর? আমার মা? আমার মাকে যে যাই বলুক—ও কিন্তু বড় ভাল মেয়ে; আমাকে সে কোনদিন থিয়েটার দেখতে দিত না। একদিন দেখেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। ওই যেখানটায় কুন্তী এসে

দাঁড়িয়েছেন কর্ণের কাছে গঙ্গার ধারে। হ্যাঁ স্যর, আমার মা-ই সেজে-ছিল কুন্তী। মাকে তখন যদি আপনি দেখতেন! কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল! সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর!

—এই চ্যাটার্জি, পাঁচ বাজ গিয়া, যাও, তৈয়ার হো যাও তুরন্ত্!

বুলওয়ার্কের কাছে তন্ময় হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রণব। পিছন থেকে সেন্ট্রির কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি চলে গেল ছুটে। ছেলেরা উঠেছিল কেউ-কেউ—বললে,—গিয়েছিলি কোথায়? চান করে নে শীগ্‌গির।

স্নান সেরে আসতেই আরেকজন বললে, বিউগ্‌ল্ শক্ত হাতে ধরবি! কোনও ভুল যেন না হয়! প্র্যাক্‌টিস তো বহু করেছিস?

—তা করেছি।

—তবে আর কী। ভুল করে চ্যাটার্জি-সাহেবের চড়-চাপড় খেয়ো না।

প্রণব বললে, মারেন বুঝি?

মল্লিক বললে, ওর সঙ্গে একটা জাহাজে আমি ছিলাম। চড়-চাপড় লেগেই আছে। ভুলের মাত্রা বেশী হলেই বেত মারার হুকুম হয়ে যাবে। পাঁচ থেকে, চাই কী দশ ঘা।

পূর্ব দিগন্তে প্রথমেই একটা অস্ফুট আলোর ছটা দেখা দিল। একটু হলদে, অল্প লাল। বিউগ্‌ল্ হাতে ঝকঝকে পোশাকে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে প্রণব। আদিত্যের এই বুঝি হিরণ্ময় রূপ! দেখতে দেখতে মনে জেগে উঠল হঠাৎই সেই কর্ণ আর কুন্তীর কথা। কর্ণের মত তারও যেন বলতে ইচ্ছা করল, দিবাকর যদি আমার পিতা, তাহলে এ অবস্থা কেন আমার? বল মাতা, হীন সুতপুত্র বলে কেন ঘৃণা করে আমাকে সবাই?

কিসের আবেগে যেন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ দুটি হঠাৎ এল জলে ভরে। কিন্তু ততক্ষণে ঘণ্টা বেজে গেছে, ততক্ষণে দূর উদয়চক্রে দেখা

দিয়েছে তাঁর 'প্রস্তাব'-রূপ, যে রূপ দেখলে মানুষ হয় "প্রশংসার জন্য লালায়িত।"—

কেঁপে গেল কণ্ঠ, স্বর ফুটল না ভাল করে, বিউগ্‌ল্‌-এ সুর উঠলই না স্পষ্ট হয়ে।

মল্লিক-সমসের—ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কী শাস্তি হয় কে জানে।

সেন্ট্রি-পোস্টের কাছে বোর্ডের পাশে নীরব হয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রণব বহুক্ষণ ধরে। তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে একে একে সবাই গেল ফিরে, সেন্ট্রিও চলে গেল। ডিউটির হল পরিবর্তন, এখুনি আসবে নতুন লোক। বোর্ডের লেখা এখুনি যাবে মুছে। ধারে-কাছে কেউ নেই, হঠাৎ ওপরের সিঁড়ি বেয়ে নিজেই নেমে এলেন চ্যাটার্জি। তীক্ষ্ণ, তীব্র কণ্ঠে ডাকলেন, প্রণব?

নমস্কার করল প্রণব। বলল, স্যর?

—সূর্যপ্রণাম করতে পারলে না তো?

অধোমুখে নীরব রইল প্রণব। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালেন চ্যাটার্জি। বললেন, জীবনে সানরাইজ-বয় হওয়া তোমার এই প্রথম। হেরে গেলে!

প্রণবের তখনও নতমুখ লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হারবার ছেলে তো তুমি নও! কী হয়েছিল তোমার?

বলতে বলতে হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল সেই কালো বোর্ডটার দিকে। তাঁরই নামের নীচে যেখানে লেখা ছিল—সানরাইজ বয়—সি তিনহাজার অত—প্রণব চ্যাটার্জি, সেখানে চ্যাটার্জি শব্দটা কেটে দিয়ে খড়ি দিয়ে পরিবর্তে কে যেন লিখে রেখেছে বসু। প্রণব বসু।

কী হল কে জানে, কম্যাণ্ডিং অফিসার কোন শাস্তির কথা উচ্চারণ না করে ছেলেটিকে হঠাৎই টেনে নিলেন বুকের মধ্যে, বলে উঠলেন, রাত্রে মায়ের যে চিঠিটা পেয়েছিলে, তাতে এই সংবাদই ছিল কী?

—হ্যাঁ।